বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

রচনা
ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
গীতাঞ্জলি বড়ুয়া
ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
উত্তরা চৌধুরী

সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক

মোঃ জিয়াউল হক

আলেয়া আক্তার

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

তিতাস চাকমা

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ

লেজার স্ক্যান লিমিটেড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সদাচরণ, সর্বজীবে দয়া ও সংযম অনুসরণে আগ্রহী হবে। গৌতম বুদ্ধের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষার্থীরা সৎ ও আলোকিত জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দ পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের সাম্যনীতি	১-৮
দ্বিতীয়	বন্দনা	৯-১৮
তৃতীয়	শীল	১৯-২৮
চতুর্থ	দান	২৯-৩৭
পঞ্চম	সূত্র ও নীতিগাথা	৩৮-৪৮
ষষ্ঠ	পারমী	৪৯-৬০
সপ্তম	ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব	৬১-৭৩
অষ্টম	চরিতমালা	৭৪-৮৫
নবম	জাতক	৮৬-১০১
দশম	বৌদ্ধ তীর্থস্থান	১০২-১১২
একাদশ	বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান: সম্রাট কণিষ্ক	১১৩-১১৯

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের সাম্যনীতি

গৌতম বুদ্ধকে সাম্যনীতির প্রবক্তা বলা হয়। সাম্যনীতি শব্দটি 'সাম্য' ও 'নীতি' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সাম্যনীতি বলতে বৈষম্যহীনতা, ন্যায় বিচার, মৌলিক অধিকার, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা বোঝায়। সাম্যনীতি হচ্ছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য নীতি যার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বুদ্ধের ধর্মে এ নীতির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বুদ্ধ তাঁর সংঘ পরিচালনায় সাম্যনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ন্যায় বিচার ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তিনি সাম্যনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান বৈষম্যগুলো দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের সাম্যনীতি সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* গৌতম বুদ্ধের সাম্যনীতি বর্ণনা করতে পারব
* পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বুদ্ধের সাম্যনীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বুদ্ধের সাম্যনীতি

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু (বর্তমান নেপাল) নামক রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে তিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। তিনি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচার করে আশি বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

তাঁর সময়কালে সমাজজীবনে জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিল। এ সামাজিক বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য তিনি তাঁর ধর্মে সাম্যনীতিকে অগ্রাধিকার দেন। বৌদ্ধধর্ম মতে, সাম্যনীতি হচ্ছে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তি। সকল প্রকার দুঃখ, বৈষম্য, অন্যায়, অবিচার, ঘৃণা, সংঘাত প্রভৃতি বিদূরিত করার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে সাম্যনীতি। তাই সমাজে সাম্যনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য। সাম্যনীতির কারণেই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের সীমারেখা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এজন্য কোনো যুদ্ধ বা রক্তপাত ঘটেনি। বুদ্ধের সাম্যনীতি মানুষকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। অপরের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহিষ্ণু হতে শেখায়। জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল বৈষম্য ও বিভাজন বিদূরিত করে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। এ আদর্শকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ প্রথমেই ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় সাম্যনীতির প্রয়োগ করেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ মহাউপাসিকা বিশাখা নির্মিত শ্রাবস্তীর পূর্বারামে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপলক্ষ করে বলেন: 'ভিক্ষুগণ! গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ ইত্যাদি নদী সমুদ্রে মিলিত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র

সত্ত্বা ও নাম হারিয়ে ফেলে, তেমনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র আমার ধর্মে প্রবেশ করে জাতি, গোত্র ও নাম হারিয়ে ফেলে। এখানে সকল মানুষ সমান।'

উপরের বাণী থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ সকল পেশাজীবি মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধের সময়কালে সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল। তখন চণ্ডাল, মেথর, মুচি প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিতদের নিম্নবর্ণ হিসেবে অভিহিত করা হতো। এরা অস্পৃশ্য ছিল এবং অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করত। তারা সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারত না। ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। তারা ঘৃণিত ছিল এবং অন্যরা তাদের স্পর্শ থেকে দূরে থাকত। কিন্তু বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু আনন্দ চণ্ডাল কন্যার হাত থেকে পানি পান করে সেই সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এমন কি বুদ্ধ বৈশালীর বারবণিতা আম্রপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সমাজে তার মানবিক অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সুত্রনিপাত গ্রন্থের বসল সূত্র পাঠে জানা যায় যে, 'মাতঙ্গ ছিল জন্মসূত্রে এক চণ্ডাল পুত্র। পরবর্তীতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সকল প্রকার লোভ দ্বেষ-মোহ, তৃষ্ণা ও কামরাগ পরিত্যাগ করে শীল, সমাধি প্রজ্ঞা অনুশীলনপূর্বক দুর্লভ শ্রেষ্ঠ কীর্তি অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর সেবা ও পরিচর্যা করার জন্য অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুত্র নিয়োজিত হয়েছিলেন।' এ সূত্রে আরো উল্লেখ আছে যে, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও অনেকে পাপকার্যে লিপ্ত থাকত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধ্যাত্মিকতায় কিংবা অর্হত্ব বা নির্বাণ লাভের জন্য জাতি, গোত্র, বর্ণ যেমন প্রতিবন্ধক নয় তেমনি সহায়কও নয়। কুশল-অকুশল কর্মই মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে। ত্রিপিটকের সুত্তনিপাত গ্রন্থের 'বসল সূত্রে' বুদ্ধ বলেছেন:

ন জচ্চা বসলো হোতি, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
কম্মুনা বসলো হোতি, কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো।।

অর্থাৎ জন্মের দ্বারা কেউ বসল বা চণ্ডাল হন না, তেমনি জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হন না। কর্মের দ্বারা চন্ডাল হয়, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হন।

ধর্মপদ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ বর্গেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো।।

অর্থাৎ জটার দ্বারা, গোত্রের দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। বরং যিনি সদ্ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়েছেন তিনিই পবিত্র এবং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বাসেট্ঠ সূত্রে বুদ্ধ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, 'জাতি হিসেবে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পদচিহ্ন একই রূপ। হাতি, ঘোড়া, বাঘ এরূপ চতুষ্পদ প্রাণীদের মতো মানুষে মানুষে দৈহিক গঠনে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চঞ্চু প্রভৃতিতে পার্থক্য আছে। মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না।' মূলত, জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষে মানুষে অথবা জাতিতে জাতিতে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

বুদ্ধের সময়কালে কন্যা সন্তানের জন্ম কাম্য ছিল না। সংযুক্ত নিকায়ের কোসল সংযুক্ত পাঠে জানা যায় যে, রাজমহিষী মল্লিকাদেবী কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন শুনে কোশলরাজ প্রসেনজিত খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। বুদ্ধ জানতে পেরে রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে রাজা প্রসেনজিতকে বললেন, 'কন্যা সন্তানের জন্ম হেতু কারও দুঃখ পাওয়া উচিত না; কন্যা যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্মপ্রাণ, সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল হয়, তাহলে কন্যা সন্তান পুত্রাপেক্ষা শ্রেয়সী হবার যোগ্যতা রাখে। এমনকি এই কন্যা সন্তান রত্নগর্ভাও হতে পারে। তার গর্ভজাত সন্তান ভবিষ্যতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারে এবং সুবিশাল রাজ্যের অধিশ্বর হতে পারে।' বুদ্ধের বাণী শুনে রাজা প্রসেজিত কন্যা সন্তানের জন্মকে শুভ বলে মেনে নেন।

বুদ্ধের সময়কালে এরূপ অনেক ধরনের বৈষম্য প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সাম্যনীতির মাধ্যমে তথাকথিত সামাজিক বৈষম্যগুলো দূরীভূত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অনাদিকাল থেকেই মানুষ সমাজে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আসছে। বুদ্ধই প্রথম সমাজে সাম্যনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের সাম্যনীতির শিক্ষা কী?

কীসের দ্বারা মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হয়?

পাঠ : ২

বুদ্ধের সাম্যনীতির প্রয়োগ

বুদ্ধের সমকালীন সমাজে নিম্নশ্রেণির মানুষের তেমন কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার ছিল না। বুদ্ধ অবহেলিত নিম্নশ্রেণির মানুষকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। সে সময়ে সমাজে নিম্নশ্রেণির মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ধর্ম ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষায় বিধি-নিষেধ ছিল। বুদ্ধ সঙ্ঘ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে ধর্ম ও বিদ্যা চর্চায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নিচে প্রাসঙ্গিক একটি কাহিনী বর্ণনা করা হলো :

বুদ্ধের সময়কালে রাজগৃহের একপ্রান্তে এক অস্পৃশ্য দরিদ্র ধাঙর (মেথর) পরিবার বাস করত। সেই পরিবারে সুনীত নামক এক ছেলে ছিল। বড় হয়ে সেও জাতের পেশা গ্রহণ করে। রাজপথ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা, ময়লা-আবর্জনা নগরের বাইরে নিক্ষেপ করা প্রভৃতি ছিল তার নিত্য কাজ। এ কাজে কটুক্তি ও তিরস্কার ছিল তার নিত্য পাওনা। অস্পৃশ্য বলে তাচ্ছিল্য, অবহেলা ও অনাদরে তার দিন কাটত। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সে গ্লানিময় জীবনের কথা ভাবত।

একদিন সে ঝুঁড়িভর্তি আবর্জনা নিয়ে পথ চলছিল। তখন সে পথে সশিষ্য বুদ্ধ নগরে আসছিলেন। বুদ্ধ কাছাকাছি এলে সে আবর্জনার ঝুঁড়ি নামিয়ে সকলের ছোঁয়া এড়িয়ে কুণ্ঠিতভাবে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

মনে মনে ভাবছিল, আহা ! আমি যদি ভগবান বুদ্ধের পদতলে ঠাঁই পেতাম ! বুদ্ধ তার মনোবাসনা জানতে পেরে তার সামনে এসে মৈত্রীময় দৃষ্টিতে তাকালেন। বুদ্ধ তার মাথায় হাত রেখে বললেন, এসো সুনীত ! আমার সঙ্গে বিহারে চলো। সুনীত বিস্ময়ে হতবাক হলো। সে ভাবল, 'আমি রাস্তার ঝাড়ুদার, সবার অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু সর্বজন পূজ্য ভগবান বুদ্ধ আমাকে স্পর্শ করে স্নেহজড়িত কণ্ঠে আহ্বান করলেন।' সে আবেগ-বিহ্বল হয়ে বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়ল। অতঃপর বুদ্ধ তাকে বিহারে নিয়ে দীক্ষা দেন এবং ভিক্ষুসংঘে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সংঘে প্রবেশ করে অল্পকালের মধ্যে সুনীত সর্ব আসক্তি ক্ষয় করে অর্হত্ব লাভ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এরূপ আরো অনেক কাহিনী পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায় যে, সুনীতের মতো অনেকে বুদ্ধের সঙ্ঘে প্রবেশ করে মেধার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। যেমন: উপালী ছিলেন নাপিতপুত্র। তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্যে পরিণত হন এবং বিনয়ে পারদর্শীতা অর্জন করে 'বিনয়ধর' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি বিনয় সম্পর্কিত বুদ্ধের সকল দেশনা স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তিনি প্রথম মহাসঙ্গীতিতে বুদ্ধ দেশিত বিনয়সমূহ আবৃত্তি করেন, যা বিনয় পিটকে সংকলিত আছে। অনুরূপ কুল্ল স্থবির ছিলেন কৃষক। 'যশ স্থবির' ছিলেন মালীর পুত্র। 'হিরণ্যক স্থবির' ছিলেন এক চোরের পুত্র। 'ছন্ন' বা 'ছন্দক' ছিলেন দাসীর পুত্র। গণিকা আম্রপালির পুত্র ছিলেন 'বিমল স্থবির'। এ ধরনের আরো অনেক সাধারণ ঘরের মানুষ বুদ্ধের শিষ্য হয়ে কর্ম গুণে যশ, খ্যাতি এবং গৌরব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এভাবে বুদ্ধ সকল পেশার লোককে সঙ্ঘে প্রবেশ ও ধর্ম চর্চার অধিকার দিয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। জন্ম ও জীবিকার কারণে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার প্রচলিত প্রথা বুদ্ধ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

বিভিন্ন বংশ হতে আগত ভিক্ষুগণ একত্রে ধর্ম শ্রবণ করছেন

জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণবৈষম্য বিলোপ সাধনের অনেক উদাহরণ বুদ্ধের জীবনচরিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের ধর্মে সর্বস্তরের মানুষ স্থান লাভ করেছে। তাদের মধ্যে কুল্ল স্থবির ছিলেন কৃষক। যশ স্থবির ছিলেন মালীর পুত্র। হিরণ্যক স্থবির ছিলেন এক চোরের পুত্র। ছন্ন বা ছন্দক ছিলেন দাসীর পুত্র। গণিকা আম্রপালির পুত্র ছিলেন বিমল স্থবির। এ ধরনের আরো অনেক সাধারণ ঘরের মানুষ বুদ্ধের শিষ্য হয়ে যশ, খ্যাতি এবং গৌরব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বুদ্ধের সময়কালে নারী সঙ্ঘভুক্ত হয়ে বা স্বাধীনভাবে ধর্ম ও বিদ্যা চর্চা করতে পারতেন না। বুদ্ধ ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়নে নারীদের সুযোগ করে দেন। ত্রিপিটকে, বিশেষত থেরীগাথা গ্রন্থে অনেক নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা ধর্ম ও বিদ্যা চর্চায় পারদর্শীতা ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। থেরীগাথা পাঠে জানা যায় যে, সুমঙ্গলের মা সংসারের অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধ্যান সাধনা করেন। এতে তিনি তার মনের রিপুসমূহ সংযত করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। বৈশালী নগরীর গণিকার কন্যা বিমলা একদিন মৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের উপদেশে ভিক্ষুণী হন। পরে তিনি কঠোর সাধনার মাধ্যমে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। এভাবে ব্যাধের মেয়ে চাঁপা, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের দাসী পূর্ণিকা, স্বর্ণকারের কন্যা শুভা, দরিদ্র পরিবারের মেয়ে কৃশা গৌতমী বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গভীর সাধনার মধ্য দিয়ে অর্হত্ব ফল লাভ করতে সক্ষম হন। তাছাড়া তাঁর ধর্মে রাজা, মহারাজা, রানি, রাজকন্যা, শ্রেষ্ঠী কন্যাও স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের মহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মহারাজ বিম্বিসারের রানি ক্ষেমা, কোশলের মহারাজার বোন সুমনা অন্যতম। ভিক্ষুণীদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম ও দর্শন চর্চায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম দেশনায়, বিনয়কর্ম সম্পাদনে এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁরা ভিক্ষুদের সমকক্ষ হতে পেরেছিলেন। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় বুদ্ধ আনন্দকে বলেছিলেনঃ 'হে আনন্দ! পুরুষের ন্যায় নারীরাও শ্রামণ্যফলের অধিকারী হতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'নারীরা উচ্চতর শ্রামণ্যফল লাভের যোগ্য এবং ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, ধর্মদিন্না, ভদ্দকপিলানীর ন্যায় ভিক্ষুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমার প্রবর্তিত শাসনের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হবে না।' বুদ্ধের এ বাণীতে ধর্ম ও বিদ্যা চর্চায় নারীরা পুরুষের সমকক্ষ তা স্বীকৃত হয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উপালীর উপাধি কী ছিল? তিনি স্মৃতিতে কী ধারণ করে রাখতেন?

কতিপয় বুদ্ধ শিষ্যের নাম লেখ যাঁরা বিভিন্ন পেশা থেকে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় বুদ্ধ আনন্দকে কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৩

বৌদ্ধ সাম্যনীতির সামাজিক প্রভাব

সমাজ জীবনে বুদ্ধের সাম্যনীতির অশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের সময়কালে তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিসেবে সমাজে যারা অবহেলিত, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত ও ঘৃণিত ছিল তারা বুদ্ধের সাম্যনীতির প্রভাবে আত্ম- মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা লাভ করেছিল। বুদ্ধের সাম্যনীতি প্রমাণ করেছে যে, পেশাগত দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে সমাজে যে কেউ প্রতিষ্ঠা ও সুখ্যাতি লাভ করতে পারে। এই সত্যটি উপলব্ধি করে সেদিন জন্মগত কারণে অবহেলিত মানুষগুলো কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বুদ্ধের সাম্যনীতির ফলে ধর্ম ও বিদ্যা চর্চায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নারীদের মুক্ত চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হয়।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটেও বুদ্ধের সাম্যনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বুদ্ধের সাম্যনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে :

১। জাতিগত বিদ্বেষ দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

২। সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৩। পরধর্ম ও পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৪। পেশা ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৫। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৬। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৭। পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিরাজমান সকল বৈষম্য দূর করা যেতে পারে।

অনুশীলনমূলক কাজ

শ্রেণিকক্ষে তুমি কীভাবে সাম্যনীতি প্রয়োগ করতে পার লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গৌতম বুদ্ধ সবার আগে কাকে দীক্ষা দেন ?

ক. যশ স্থবিরকে
খ. বিমল স্থবিরকে
গ. উপালীকে
ঘ. হিরণ্যক স্থবিরকে

২। সাম্যনীতি প্রয়োগের ফলে –

i. সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ii. পেশা ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

iii. শত্রু শত্রুকে বিনাশ করে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বর্ণালী ও মৌনিতা সিংহ এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। এক বিয়ের অনুষ্ঠানে বর্ণালীর সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে মৌনিতা তিরস্কার করে। কিন্তু বর্ণালী এতে রাগ অভিমান না করে নীরবে সহ্য করে। পরীক্ষার ফলাফলে বর্ণালী জিপিএ-৫ এবং মৌনিতা বি গ্রেড পেয়ে পাস করে। বর্ণালীর ভালো ফলাফল মৌনিতার মনে নাড়া দেয়।

৩। মৌনিতা সিংহের আচরণে বুদ্ধের কোন শিক্ষা লংঘিত হয়েছে ?

ক. সহনশীলতা খ. সাম্যের

গ. সহমর্মিতার ঘ. শ্রদ্ধার

৪। উক্ত নীতি অনুসরণে মৌনিতা সিংহের আচরণিক পরিবর্তন ঘটবে –

i. কাউকে ছোট করে না দেখা

ii. আভিজাত্যের গর্ববোধ করা

iii. পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। প্রণী খীসা একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী। শিক্ষা জীবনের পাঁচজন বান্ধবীও কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তাদের সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় প্রণী অন্যত্র গিয়ে কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণার দ্বারা নতুন কম্পিউটার প্রোগ্রাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। পরে নিজ এলাকায় একটি কম্পিউটার ক্লাব গঠন করেন। তারপর তিনি অবহেলিত ছেলে-মেয়েদের কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তাঁর ক্লাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান আহরণের সুযোগ করে দেন। এতে তাঁর উদ্ভাবিত কম্পিউটার বিষয়ক জ্ঞান চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ক. গৌতম বুদ্ধ সঙ্ঘে কোন নীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ?

খ. ভিক্ষুণীসঙ্ঘ বৌদ্ধধর্মে কী ভূমিকা রেখেছিলেন ? ব্যাখ্যা কর ।

গ. প্রণী খীসার কর্মকাণ্ডে বুদ্ধের সাম্যনীতির কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. তুমি কী মনে কর প্রণী খীসার জীবনে বুদ্ধের সাম্য নীতির শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও ।

২। কৌশিক এক গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে । সে অত্যন্ত মেধাবী ছিল । তার গুণে মুগ্ধ হয়ে সমাজের সচ্ছল ব্যক্তি পুলিন বড়ুয়া কৌশিকের লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করেন । লেখাপড়া শেষ করে কৌশিক চাকুরিতে উচ্চ পদে যোগদান করে । তারপর কৌশিক ধনীগরিব নির্বিশেষে সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে ।

ক. শ্রাবস্তীর পূর্বারাম বিহার কে নির্মাণ করেন ?

খ. বুদ্ধ নারীদের সম অধিকার দিয়েছিলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর ।

গ. পুলিন বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডটি বুদ্ধের সাম্যনীতির প্রতিফলন– ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. 'জন্ম নয় কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হয়' – এ বাক্যটি কৌশিকের জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে বুদ্ধের সাম্যনীতির আলোকে বিশ্লেষণ কর ।

শূন্যস্থান পূরণ

১. গৌতম বুদ্ধকে . . . . . প্রবক্তা বলা হয় ।

২. সাম্যনীতি হচ্ছে . . . . . প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তি ।

৩. কুশল-অকুশল . . . . . মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে ।

৪. পুরুষের ন্যায় . . . . . শ্রামণ্যফলের অধিকারী হতে পারে ।

৫. সকলের . . . . . নিশ্চিত করা যেতে পারে ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'সাম্যনীতি' বলতে কী বোঝায় ?

২. বুদ্ধ বসল সুত্তে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

৩. কে 'বিনয়ধর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ? কেন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধের সাম্যনীতি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান কর ।

২. বৌদ্ধ সাম্যনীতির সামাজিক প্রভাব আলোচনা কর ।

৩. সাম্যনীতি বিষয়ক কাহিনীটি তোমার নিজের ভাষায় লেখ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্দনা

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘকে ত্রিরত্ন বলা হয়। বৌদ্ধরা বন্দনার মাধ্যমে ত্রিরত্নের গুণরাশি স্মরণ করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ছোট গাথায় বর্ণিত ত্রিরত্ন বন্দনাটি পাঠ করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সঙ্ঘের নয়গুণ সমন্বিত ত্রিরত্ন বন্দনাটি পড়ব। এ বন্দনাটি খুবই সুপরিচিত। বৌদ্ধরা সাধারণত সকাল-বিকাল দুবেলা গৃহে বুদ্ধাসনের সামনে বা বিহারে গিয়ে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবে ত্রিরত্ন বন্দনাটি আবৃত্তি করে।

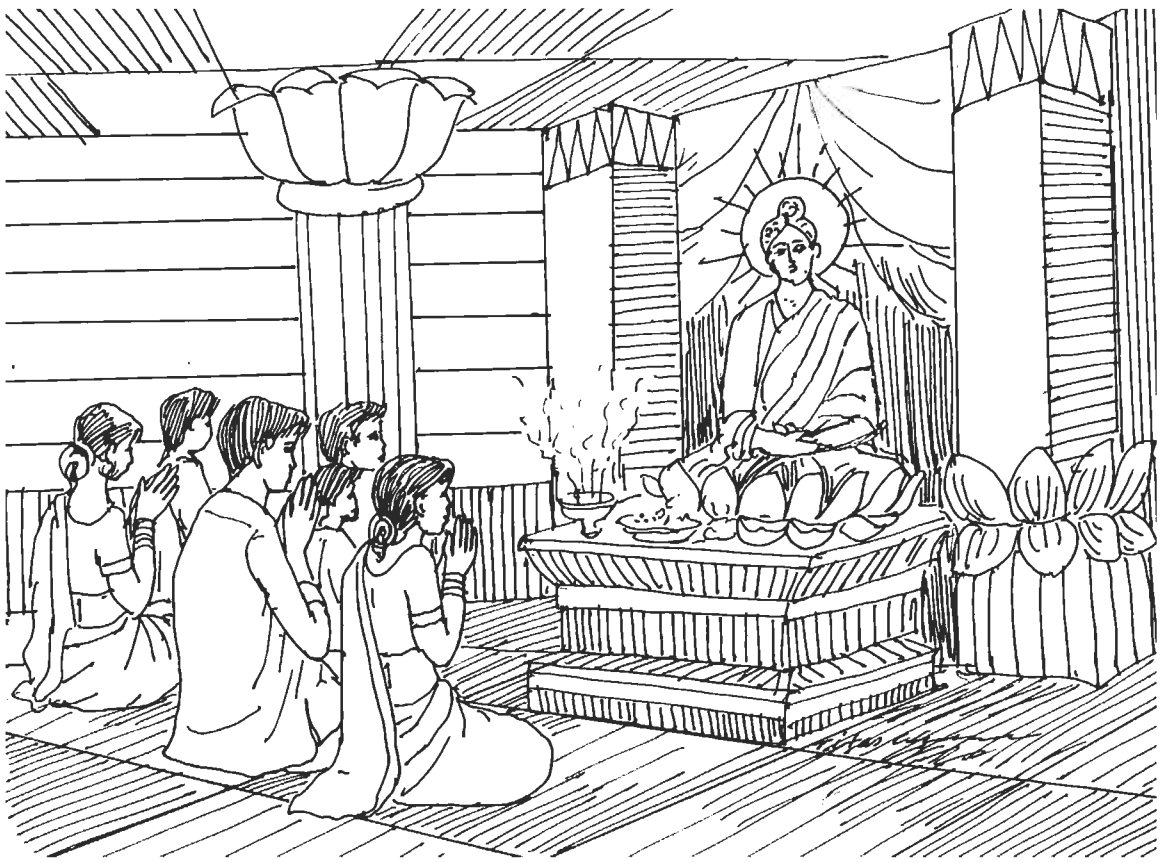

ত্রিরত্ন বন্দনারত উপাসক-উপাসিকা

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* ত্রিরত্ন বন্দনার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।
* ত্রিরত্ন বন্দনা বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় বলতে পারব।
* ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ত্রিরত্ন বন্দনা ও নিয়মাবলি

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের গুণরাশি স্মরণ করে যে বন্দনা করা হয় তাকে ত্রিরত্ন বন্দনা বলে। বিভিন্নভাবে ত্রিরত্নের গুণরাশি বর্ণনা করে ত্রিরত্ন বন্দনা করা হয়। ফলে বিভিন্ন রকম ত্রিরত্ন বন্দনা পাওয়া যায়। কোনো ত্রিরত্ন বন্দনা ছোট, কোনটি মধ্যম সারির, আবার কোনোটি বড়। এসব বন্দনায় ত্রিরত্নের অসীম গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিরত্নের এসব মহৎ গুণাবলি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করাই ত্রিরত্ন বন্দনার মূল উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন নিয়মাবলি অনুসরণ করে ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। নিচে ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়মাবলিসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে নিতে হয়। প্রয়োজনবোধে স্নানও করা যায়।

২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হয়।

৩. মনকে সমাহিত ও লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত রাখতে হয়।

৪. হাঁটু ভেঙে করজোড়ে বসে বন্দনা করতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়মাবলি অনুসরণ পূর্বক ত্রিরত্ন বর্ণনা কর। (শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে)

পাঠ : ২

ত্রিরত্নের গুণাবলি

ত্রিরত্নের গুণাবলি অপরিসীম। কিন্তু এ অধ্যায়ে বর্ণিত ত্রিরত্ন বন্দনায় বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সঙ্ঘের নয়গুণের কথা বলা হয়েছে। এসব গুণ রত্নের চেয়েও অধিক মূল্যবান। নিচে এসব গুণ বর্ণনা করা হলো :

বুদ্ধগুণ :

বুদ্ধের নয়গুণ। যথা :

১. তিনি অর্হৎ। 'অরি' শব্দের অর্থ শত্রু । লোভ, দ্বেষ, মোহ, অজ্ঞানতা, অহঙ্কার, মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ, আলস্য, মনের অস্থিরতা, লজ্জাহীনতা ও পাপভয়হীনতা প্রভৃতি অরিকে হত বা বিনাশ করেছেন বলে তিনি অর্হৎ। পুনর্জন্মের কারণ ধ্বংস করেছেন বিধায় আর জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করবেন না। এ কারণে তিনি অর্হৎ।

২. তিনি সম্যক সম্বুদ্ধ। কারণ তিনি স্বয়ং সকল ধর্ম ও সকল বিষয় সম্যকরূপে জেনেছেন এবং সম্যকরূপে দেশনাও করেছেন।

৩. তিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন। কারণ তিনি অষ্টবিদ্যা এবং পনের প্রকার আচরণ সম্পন্ন। অষ্টবিদ্যা হচ্ছেঃ বিদর্শন জ্ঞান, মনোময় ঋদ্ধি, ঋদ্ধিশক্তি, দিব্যশ্রোত জ্ঞান, পরের চিত্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, পূর্বজন্ম বা নিবাস স্মরণ করার জ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান এবং কাম তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান। পনের প্রকার আচরণ হচ্ছে : শীল, ইন্দ্রিয় সংযম, আহারের মাত্রা জ্ঞান, সর্বদা সজাগ থেকে আত্মরক্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, পাপভয়, শ্রুতি বা পাণ্ডিত্য, উৎসাহ, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান প্রভৃতি আচরণ সম্পন্ন।

৪. তিনি সুগত। তিনি পরম শান্তিময় নির্বাণে গত বা উপনীত হয়েছেন বলে সুগত।

৫. তিনি লোকজ্ঞ। সমস্ত লোকের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল) বিষয় বিদিত জ্ঞাত বলে তিনি লোকবিদূ বা লোকজ্ঞ।

৬. তিনি অনুত্তর। কারণ নির্বাণ ধর্মে তিনি ব্যতীত অন্যকোনো শিক্ষক নেই। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন গুণে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ ছিলেন না বা তাঁর সমানও কেউ ছিলেন না বলে তিনি অনুত্তর গুণ সম্পন্ন।

৭. পুরুষদম্য সারথী। সারথী যেমন অদম্য অশ্বকে দমন করে তেমনি বুদ্ধ অদম্য, দুর্বিনীত, কাম- ক্রোধাদি বশত উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দমনপূর্বক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত এবং নির্বাণ লাভ করাতে সক্ষম বা পারঙ্গম বলে তিনি পুরুষদম্য সারথী।

৮. তিনি দেব ও মনুষ্যগণের শাস্তা। কারণ তিনি পরম সত্য দ্বারা অনুশাসন করেন এবং দেবতা ও মনুষ্যদের ধর্মোপদেশ দিয়ে নির্বাণ লাভ করান।

৯. তিনি বুদ্ধ -ভগবান। জানার যত বিষয় আছে তা অবগত হয়েছেন এবং অবগত হয়ে অন্যকে দেশনা করেছেন বলে তিনি বুদ্ধ। অগ্নিসদৃশ রাগ-দ্বেষ, মোহ ধ্বংস করে ভবসমূহে আগমন-নির্গমনের পথ রুদ্ধ করেছেন বলে তিনি ভগবান।

ধর্মগুণ :

ধর্মের ছয়গুণ। যথা :

১. এই ধর্ম সুব্যাখ্যাত বা সুপ্রকাশিত।

২. এই ধর্ম স্বয়ং দ্রষ্টব্য বা নিজে নিজে দেখার যোগ্য।

৩. এই ধর্ম কালাকাল বিহীন। যখনই এ ধর্ম পালন করা হয় তখনই ফল পাওয়া যায়।

৪. এই ধর্ম এসে দেখা বা নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনার যোগ্য।

৫. এ ধর্ম নির্বাণ প্রাপক অর্থাৎ নির্বাণে উপনীত করে।

৬. এই ধর্ম বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও জ্ঞাতব্য।

সঙ্ঘ গুণ :

সঙ্ঘের নয়গুণ। যথা :

১. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন অর্থাৎ সত্যপথের অনুসারী। তাঁরা এ পথ অবলম্বন করে নির্বাণাভিমুখে গমন করছেন। তাই ভিক্ষুসংঘ সুপ্রতিপন্ন।

২. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ ঋজু প্রতিপন্ন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের সোজা বা ঋজুপথ। বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ এ পথে চলেছেন। তাই তাঁরা ঋজু প্রতিপন্ন।

৩. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ ন্যায় প্রতিপন্ন। বুদ্ধ নির্দেশিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের সঠিক বা যথার্থ পথ। বুদ্ধশিষ্যগণ এই পথ অনুসরণ করেন বলে তাঁরা ন্যায় প্রতিপন্ন।

৪. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ সমীচিন বা উত্তমভাবে প্রতিপন্ন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের উপযুক্ত বা উত্তম পথ। বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ এ পথে পরিচালিত বলে তা সমীচিনভাবে প্রতিপন্ন।

৫. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ আহ্বানের যোগ্য। চারিপ্রত্যয় অর্থাৎ চীবর, পিণ্ড, শয়নাসন ও ঔষধ পথ্যাদি দান দেয়ার উপযুক্ত পাত্র। এঁদের দান দিলে মহাফল লাভ হয়।

৬. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ পাহুনেয়্য। 'পাহুন' শব্দের অর্থ দূরদেশ হতে আগত জ্ঞাতি-মিত্রগণের সৎকারের জন্য সংগৃহীত বস্তু। বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ এরূপ বস্তু দান ও গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র।

৭. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ দক্ষিণা বা দানের যোগ্য।

৮. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অভিবাদনযোগ্য।

৯. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। উর্বর ভূমিতে যেমন শস্য ভালো হয়, তেমনি উপযুক্ত পাত্রে দান দিলে অধিক পুণ্য অর্জন করা যায়। বুদ্ধের শ্রাবক শিষ্যকে দান দিলে অধিক পুণ্য অর্জন হয়। কারণ তাঁরা লোভ-দ্বেষ-মোহ বিহীন এবং সর্ব আসক্তি মুক্ত।

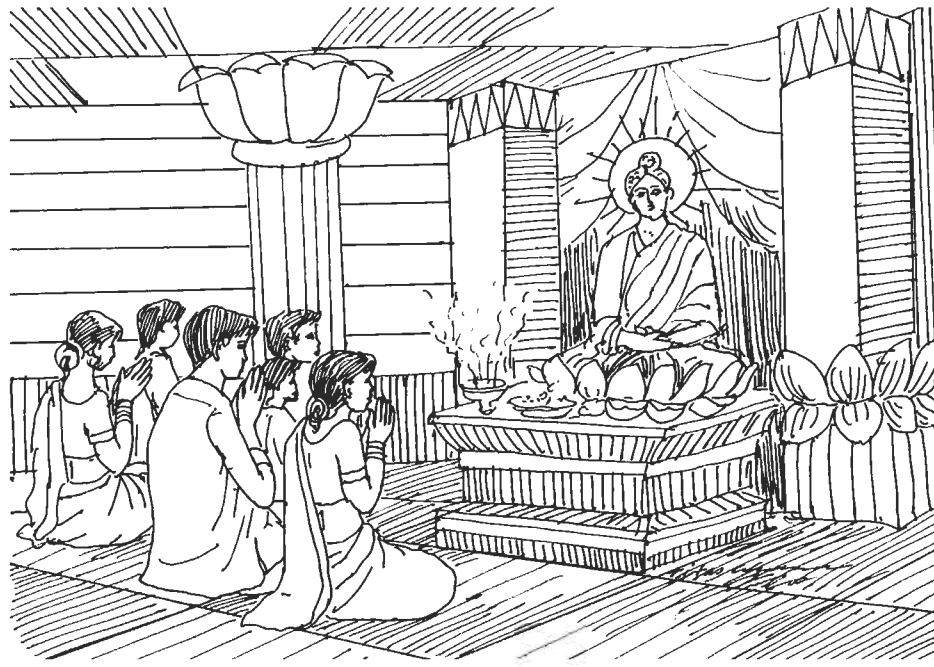

ত্রিরত্ন বন্দনারত উপাসক-উপাসিকা

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধকে কেন অর্হৎ বলা হয়?

তাকে পুরুষ দম্য সারথী বলার কারণ কী?

পাহুন শব্দের অর্থ কী?

বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘকে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বলা হয় কেন?

পাঠ : ৩

ত্রিরত্ন বন্দনা (পালি ও বাংলা)

বুদ্ধের নয় গুণ বন্দনা (পালি)

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথি, সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি ।

বুদ্ধং জীবিতং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

যে চ বুদ্ধা অতীতা চ যে চ বুদ্ধা অনাগতা,

পচ্চুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা অহং বন্দামি সব্বদা ।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং,

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং ।

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং,

বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মমং ।

বাংলা অনুবাদ :

ইনি সেই ভগবান, যিনি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুগত (সুপথ অনুসারী), লোকজ্ঞ, দেব-ব্রহ্মা-নর-যজ্ঞ, তির্যক প্রভৃতির অদম্য পুরুষ দমনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ সারথি, দেব এবং মানুষের শিক্ষক, বুদ্ধ এবং ভগবান নামে অভিহিত ।

আমি সারাজীবন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি ।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান বুদ্ধগণকে আমি সর্বদা বন্দনা করি ।

বুদ্ধের শরণ ব্যতিত আমার আর অন্য কোনো শরণ নেই । এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় হোক এবং মঙ্গল হোক ।

উত্তম অঙ্গ দ্বারা বুদ্ধের পবিত্র পাদতলে বন্দনা করছি । আমি যদি না বুঝে বুদ্ধের প্রতি কোনো রকম দোষ করে থাকি, হে বুদ্ধ আমায় ক্ষমা করুন ।

শব্দার্থ

ইতিপি সো - এই সেই, ভগবা - ভগবান, অরহং - যিনি মনের সমস্ত রিপুসমূহ বিদূরিত করেছেন, বিজ্জাচরণ - বিদ্যা ও আচরণ, সুগতো - সুগত (সুপথ অনুসারী), লোকবিদূ - লোকজ্ঞ, পুরিসো দম্ম সারথি - পুরুষ দমনকারী সারথি, সত্থা - শিক্ষক বা শাস্তা, দেবমনুস্সানং - দেব-মনুষ্যদের ।

ধর্মের ছয় গুণ বন্দনা (পালি)

স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহীতি ।

ধম্মং জীবিতং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

যে চ ধম্মা অতীতা চ যে চ ধম্মা অনাগতা,

পচ্চুপ্পন্না চ যে ধম্মা অহং বন্দামি সব্বদা ।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং ধম্মো মে সরণং বরং,

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং ।

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং,

ধম্মে যো খলিতো দোসো ধম্মো খমতু তং মমং ।

বাংলা অনুবাদ :

ভগবানের ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, নিজে দেখার যোগ্য, কালাকালবিহীন, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য ।

আমি সারাজীবন ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি ।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান ধর্মসমূহকে আমি সর্বদা বন্দনা করি ।

ধর্মের শরণ ব্যতিত আমার আর অন্যকোনো শরণ নেই । এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় হোক এবং মঙ্গল হোক ।

আমি উত্তম অঙ্গ দ্বারা ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ধর্মকে (মার্গ, ফল এবং নির্বাণ) অবনত মস্তকে বন্দনা করছি । আমি যদি না বুঝে কোনো দোষ করে থাকি, হে ধর্ম আমায় ক্ষমা করুন ।

শব্দার্থ

স্বাক্খাতো - উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, সন্দিট্ঠিকো - স্বয়ং দ্রষ্টব্য বা নিজে নিজে দেখার যোগ্য, অকালিকো - কালাকালবিহীন, এহিপস্সিকো - এসে দেখার যোগ্য, ওপনাযিকো - নির্বাণ প্রাপক, পচ্চত্তং - প্রত্যক্ষ, বেদিতব্বো - জ্ঞাতব্য, বিঞ্ঞূহি - বিজ্ঞজন কর্তৃক ।

সঙ্ঘের নয় গুণ বন্দনা (পালি)

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠপুরিসপুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,

আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো দক্খিনে য্যো অঞ্জলিকরণীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি ।

সঙ্ঘং জীবিতং পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

যে চ সঙ্ঘা অতীতা চ যে চ সঙ্ঘা অনাগতা,

পচ্চুপ্পন্না চ যে সঙ্ঘা অহং বন্দামি সব্বদা ।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং সঙ্ঘো মে সরণং বরং,

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং ।

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং সঙ্ঘঞ্চ দুবিধুত্তমং,

সঙ্ঘে যো খলিতো দোসো সঙ্ঘো খমতু তং মমং ।

বাংলা অনুবাদ :

ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, সহজ-সরল পথ প্রতিপন্ন, ন্যায় পথ প্রতিপন্ন, সমীচিন পথ প্রতিপন্ন (উত্তম পথ কিংবা উপযুক্ত পথ) । ভগবানের শ্রাবক চার যুগল (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামি, অনাগামি এবং অর্হৎ) এবং পুদ্গল হিসেবে দুপ্রকার পুদ্গল (মার্গ ও ফল ভেদে) এ আট প্রকার পুদ্গল । ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ আহ্বান যোগ্য, সৎকার যোগ্য, উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পূজার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে করজোড়ে বন্দনার যোগ্য এবং জগতের দেব-নরের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র ।

আমি সারা জীবন সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি ।

অতীত, অনাগত এবং বর্তমান সংঘকে আমি সর্বদা বন্দনা করি ।

সঙ্ঘের শরণ ব্যতিত আমার আর অন্যকোনো শরণ নেই । এ সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় হোক এবং মঙ্গল হোক ।

আমি উত্তম অঙ্গ দ্বারা দ্বিবিধ (সম্মতি ও পরমার্থ) শ্রেষ্ঠ সংঘকে বন্দনা করছি । যদি না বুঝে কোনো রকম দোষ করে থাকি, হে সংঘ আমায় ক্ষমা করুন ।

শব্দার্থ

সুপটিপন্নো - সুপথের অনুগামী, সাবকসঙ্ঘো - শ্রাবকসংঘ, উজুপটিপন্নো - সহজ-সরল বা ঋজু পথ প্রতিপন্ন, ঞায়পটিপন্নো - ন্যায় বা নির্বাণ পথ প্রতিপন্ন, সমীচিপটিপন্নো - সমীচিন, উত্তম পথ বা উপযুক্ত পথে প্রতিপন্ন, চত্তারি - চার, অট্ঠপুরিসা - আট প্রকার পুরুষ, আহুনেয্যে - আহবান যোগ্য, পাহুনেয্যা - সৎকার যোগ্য, দক্খিণেয্যো - দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীযো - অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে করজোড়ে বন্দনার যোগ, অনুত্তরং – অনুত্তর, পুঞ্ঞক্খেত্তং - পুণ্যক্ষত্র ।

পাঠ : ৪

ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ, তাঁর প্রচারিত ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ অসীম গুণের অধিকারী। ত্রিরত্নের গুণমহিমা পৃথিবীর যে কোনো রত্নের চেয়েও অধিক মূল্যবান। ত্রিরত্ন বন্দনার মাধ্যমে এসব গুণাবলি স্মরণ এবং অর্জনের চেষ্টা করা হয়। তাই ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল অনেক। নিচে কতিপয় সুফল তুলে ধরা হলো :

১. স্বভাবত মানুষের চিত্ত বা মন সতত লোভ-দ্বেষ-মোহরূপী কালিমায় আচ্ছন্ন থাকে। ত্রিরত্নের গুণরাশি স্মরণ করলে মনের কালিমাসমূহ দূরীভূত হয়।

২. চিত্ত বা মন সদা চঞ্চল, দুর্বার, দুর্দমনীয় এবং সর্বত্র বিচরণশীল। লাভ-অলাভ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিচার না করে যত্রতত্র বিচরণপূর্বক দুঃখ প্রদান করে। ত্রিরত্ন বন্দনার ফলে চিত্ত সমাহিত বা একাগ্র হয়। সমাহিত চিত্ত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন মাতা-পিতা যত না উপকার সাধন করতে পারেন, সমাহিত চিত্ত তার চেয়ে অধিক উপকার সাধন করতে পারে।

৩. চিত্ত সমাহিত হলে কায়-বাক্যও সংযত হয়। ফলে মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

৪. ধর্ম সাধনায় নৈতিক জীবন অপরিহার্য। কারণ অনৈতিক জীবন অকুশল মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে। অকুশল মনোবৃত্তি মানুষের হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে তৃষ্ণার বশবর্তী করে তোলে। তৃষ্ণায় বশীভূত মানুষ সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত থাকে। ত্রিরত্ন বন্দনা অকুশল মনোবৃত্তি দূর করে চিত্তে কুশল সংস্কার উৎপন্ন করে।

৬. চিত্তে কুশল সংস্কার উৎপন্ন হলে ব্যক্তি কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী হয়। কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়।

৬. পুণ্য অর্জনের ফলে মৃত্যুর পর সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

৭. নিয়মিত ত্রিরত্ন বন্দনার ফলে ধর্মতত্ত্ব জানতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে অপ্রমত্তভাবে ধর্মাচরণে সচেষ্ট থাকে।

৮. ত্রিরত্ন বন্দনা অহংবোধ এবং সকল প্রকার জাগতিক ভয়-ভীতি দূর করে মানুষকে পরম শান্তি নির্বাণের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

চিত্তের স্বভাব কীরূপ?

বুদ্ধ সমাহিত চিত্ত সম্পর্কে কী বলেছেন?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'ভগবা' শব্দের অর্থ কী ?

ক. ভাগ্য
খ. ভগবান
গ. ভবিষ্যৎ
ঘ. ভোগ

২। গৌতম বুদ্ধকে সুগত বলার কারণ কোনটি ?

ক. আহ্বানের যোগ্য বলে
খ. উপযুক্ত পথে চালিত বলে
গ. নির্বাণে গমন করেছেন বলে
ঘ. লাভ সৎকারের যোগ্য বলে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিতালী বড়ুয়া বাড়িতে সকালে পুষ্প ও আহার এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করেন। মিতালী বড়ুয়া পূজার সময় স্মরণ করেন–যিনি লোকজ্ঞ, অকালিক এবং ঋজুপ্রতিপন্ন তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে বিবেচিত।

৩। মিতালী বড়ুয়ার সকাল-সন্ধ্যা পূজা করার উদ্দেশ্য কী ?

ক. ত্রিরত্নের সেবা করা
খ. ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করা
গ. সুখ-শান্তি কামনা করা
ঘ. সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা

৪। মিতালী বড়ুয়ার প্রার্থনা দ্বারা লাভ হবে –

i. চিত্ত সংযম
ii. আমিত্ববোধ দূর
iii. দুঃখ ও ভয় দূর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রূপালী বড়ুয়া বিহারে গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনাপূর্বক ভিক্ষুর নিকট গৃহীশীল গ্রহণ করেন। প্রথমত, শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ভগবানের ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত; নিজে দেখার যোগ্য। কালবিহীন, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য। দ্বিতীয়ত, ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবহেলা করা উচিত নয়। পারতপক্ষে সঙ্ঘের সেবায় ব্রতী হবেন।

ক. ত্রিরত্ন কী ?

খ. 'ত্রিরত্ন' বন্দনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

গ. রূপালী বড়ুয়াকে ভিক্ষু প্রথমত কোন গুণের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেন তা ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. 'ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবহেলা করা উচিত নয়' – এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত ? – বন্দনার আলোকে যুক্তি প্রদর্শন কর ।

২. বিনয় চাকমা খুব ভোরে উঠে রাস্তায় অনেক দূর হাঁটাচলা করে থাকেন । তিনি প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে ত্রিরত্নের গুণ শরণ করেন । একদিন তাঁর এলাকায় আটজন ভিক্ষু পিণ্ডপাত্র নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে উপস্থিত হন । বিনয় চাকমা ভিক্ষুদের নিকট এসে বন্দনা করেন এবং তাঁর পত্নীর রান্নাকৃত খাদ্যদ্রব্য দান করেন ।

ক. 'সর্বজ্ঞ' বলতে কাকে বোঝান হয়েছে ?

খ. বন্দনা করার পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে একটি নিয়ম ব্যাখ্যা কর ।

গ. উদ্দীপকে বিনয় চাকমার ঘটনায় ত্রিরত্ন বন্দনার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উক্ত বন্দনার দ্বারা বিনয় চাকমা প্রাত্যহিক জীবনে কী ফল ভোগ করবেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও ।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বন্দনায় ত্রিরত্নের -------- পরিচয় পাওয়া যায় ।

২. অরিকে হত বা বিনাশ করেছেন বলে তিনি ------ ।

৩. এই ধর্ম বিজ্ঞগণ কর্তৃক ------- ও ------- ।

৪. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ------ লাভের সোজা বা ঋজুপথ ।

৫. --------- সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয় ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অষ্টবিদ্যা কী কী?

২. বুদ্ধকে কেন লোকজ্ঞ বলা হয়?

৩. বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘকে কেন ন্যায় প্রতিপন্ন বলা হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধের নয়গুণ বর্ণনা কর ।

২. ধর্মের ছয়গুণ ব্যাখ্যা কর ।

৩. সঙ্ঘের নয়গুণ বর্ণনা কর ।

৪. ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল নিজের ভাষায় লেখ ।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল

শীল কুশল ধর্মের আধার বা প্রতিষ্ঠাভূমি। কারণ শীলের মধ্যে সমস্ত কুশল ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় লাভ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীল কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কর্মকে পরিশীলিত করে। শীল পালনে মনের পরিদাহ নির্বাপিত হয়ে শীতল হয়। তাই এসব আচরণীয় নিয়ম বা বিধি-বিধানকে শীল বলে। শীলের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত হয় বলে শীলের অপর নাম 'দমগুণ'। নৈতিক ও সুন্দর চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে শীল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে শীল শব্দের অর্থ করা হয়েছে চরিত্র। বৌদ্ধধর্মে গৃহী, শ্রমণ এবং ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় ভিন্ন ভিন্ন শীল রয়েছে। যেমন : পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল এবং প্রাতিমোক্ষশীল। এ অধ্যায়ে আমরা দশশীল সম্পর্কে পড়ব। দশশীল প্রব্রজ্যাধারী শ্রমণদের পালনীয়। তাই দশশীলকে শ্রামণ্যশীলও বলা হয়। দশশীলে শ্রমণদের পালনীয় দশটি নিয়ম বা বিধি-বিধান রয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* দশশীল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
* বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় দশশীল বলতে পারব।
* দশশীলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
* দশশীলের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
* দুঃশীলতার ফল বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

শ্রমণদের পালনীয় শীল

সিদ্ধার্থ গৌতম দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য রাজপ্রাসাদের রাজকীয় ভোগ-বিলাস, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র এবং রাজসিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় তিনি আবিষ্কার করেন দুঃখমুক্তির পথ - আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ মার্গ অনুসরণকারী নির্বাণ লাভ করেন। তাই এ মার্গ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আদর্শ মার্গ বা উত্তম পথ। সঠিকভাবে এ মার্গ অনুসরণ করার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হয়। প্রব্রজ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে : যিনি পাপমল পরিহার করেন, তিনি প্রব্রজিত নামে কথিত হন। সকল প্রকার পাপ পরিহার করার জন্য সংসার ত্যাগ করে অনাগারিক জীবন গ্রহণ করাকে প্রব্রজ্যা বলে। সংসার একটি আবর্ত বিশেষ। এ আবর্তে পতিত হলে মানুষের পক্ষে নিষ্কৃতি লাভ করা অতীব দুষ্কর। গৃহজীবনে সর্বদা নানা রকম ঝামেলা এবং বৈষয়িক চিন্তায় বিভোর থাকতে হয়। প্রব্রজ্যা জীবন ঝামেলা ও কামনা বাসনা মুক্ত। তাই প্রব্রজ্যা সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, সম্বাধো ঘরবাসো অব্‌ভোকাসো পব্বজ্জা অর্থাৎ গৃহবাস

ঝামেলাপূর্ণ, প্রব্রজ্যা আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত। প্রব্রজ্যা জীবন দুটি প্রধান ধাপে বিভক্ত। যেমন : শ্রমণ ও ভিক্ষু। প্রব্রজ্যা জীবনের প্রথম ধাপ বা শিক্ষানবিশ জীবন পালনকারীকে শ্রমণ বলা হয়। দশশীল শ্রমণদের জন্য নিত্য পালনীয়। দশশীল বিশুদ্ধ ও অনাসক্ত জীবন এবং পাপমুক্ত সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়ক বলে দশশীলকে সুচরিত শীলও বলে। শ্রামণ্য জীবনের উচ্চতর স্তর হচ্ছে ভিক্ষু জীবন। ভিক্ষু জীবন প্রব্রজ্যা জীবনের দ্বিতীয় ধাপ। ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা প্রাতিমোক্ষ শীল পালন করতে হয়। সাধারণত, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রমণ হওয়ার জন্য কমপক্ষে সাত বছর বয়স হওয়া বাঞ্চনীয়। বলা হয়ে থাকে যে, কাক তাড়াতে সক্ষম যে কেউ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রমণ হতে পারে। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা সপ্তাহকালের জন্য হলেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রামণ্য জীবন পালন করে। অপরদিকে ভিক্ষু হতে হলে বিশ বছর বয়স হতে হয়। তবে ভিক্ষু হওয়ার আগে কিছুদিনের জন্য হলেও শ্রামণ্য জীবন পালন করতে হয়।

প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছেন

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রব্রজ্যা জীবন কয়টি ধাপে বিভক্ত ও কি কি?

প্রব্রজ্যা সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

দশশীলকে কেন সুচরিত শীল বলা হয়?

পাঠ : ২

দশশীল প্রার্থনা (পালি ও বাংলা)

ওকাস অহং ভন্তে তিসরনেন সদ্ধিং পব্বজ্জা দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে তিসরনেন সদ্ধিং পব্বজ্জা দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

ততিযম্পি অহং ভন্তে তিসরনেন সদ্ধিং পব্বজ্জা দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

শেখার কৌশল

একজন প্রার্থনা করলে 'অহং' এবং সমবেতভাবে করলে 'মযং'

একজনে করলে 'যাচামি' সমবেতভাবে করলে 'যাচাম'

একজনে করলে 'মে' সমবেতভাবে করলে 'নো' বলতে হবে ।

বাংলা অনুবাদ :

ভন্তে অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন । আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করছি । ভন্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন ।

দ্বিতীয়বার ভন্তে অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন । আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করছি । ভন্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন ।

তৃতীয়বার ভন্তে অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন । আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করছি । ভন্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন ।

দশশীল (পালি)

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৫. সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৭. নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্সন বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৮. মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মন্ডন বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৯. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

১০. জাতরূপ-রজত পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

দশশীল (বাংলা)

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব-এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

২. অদত্তবস্তু গ্রহণ (চুরি) করা থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

৫. সুরা এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

৬. বিকাল বেলা ভোজন থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

৭. নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্রের উৎসব দর্শন করা থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

৮. মালাধারণ, সুগন্ধিদ্রব্যের প্রলেপ, অলঙ্কার গ্রহণ থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

৯. উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা (অত্যন্ত আরামদায়ক শয্যা) থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

১০. সোনা-রূপা বা মুদ্রা আদান-প্রদান ও গ্রহণ থেকে বিরত থাকব - এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি ।

শব্দার্থ

পব্বজ্জা - প্রব্বজ্যা, ধম্মং - ধর্ম, তিসরণেন - ত্রিশরণসহ, কত্বা - করে, অনুগ্গহং কত্বা – অনুগ্রহ করে, বেরমণী - বিরত থাকা, সীলং - শীল, সিক্খাপদং - শিক্ষাপদ, মুসাবাদা - মিথ্যাভাষণ, অদিন্নাদানা - অদত্তবস্তু (চুরি করা বা যা দেয়া হয়নি), নচ্চ - নাচ, গীতবাদিত - গান বাজনা, বিলেপন - প্রলেপ, উচ্চসযনা -উঁচুশয়ন, জাতরূপ রজতং - সোনারূপা, পটিগ্গহনা - প্রতিগ্রহণ ।

পাঠ : ৩

দশশীল পালনকারীর করণীয়

দশশীল পালনকারীকে চীবর প্রত্যবেক্ষণ, পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ, শয্যাসন প্রত্যবেক্ষণ ও গিলান (ঔষধ) প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ - এই চার প্রকার প্রত্যবেক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয় । এ প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা দশশীল পালনকারী শ্রমণের অবশ্য করণীয় ।

চীবর প্রত্যবেক্ষণ

চীবর পরিধানকারী শ্রমণকে চীবর পরিধানের কারণ চিন্তা বা ভাবনা করতে হবে। চীবর পরিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি এরূপ চিন্তা করেন : আমি অর্থ সংযুক্ত জ্ঞানে এ চীবর পরিধান করছি। চীবর ব্যবহারে চিত্ত সংযত ও সমাহিত হয়। চীবর পরিধানে শীত, তাপ, ধূলাবালি, মশা-মাছির কামড়, সরীসৃপ ও অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চীবর পরিধানে লজ্জা নিবারণ হয়। উপরোক্ত কারণেই চীবর পরিধান করছি। বিলাসিতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়।

পিন্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

ভিক্ষু-শ্রমণগণের ভিক্ষা পাত্রে খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয় যা কিছু পিণ্ডাকারে সংগৃহীত হয় তাই পিণ্ডপাত। শ্রমণগণ পিণ্ডপাত সম্পর্কে এরূপ চিন্তা বা ভাবনা করেন : ভিক্ষা লব্ধ আহার আমি অর্থ সংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে ভৈষজ্যবৎ (ঔষধের ন্যায়) অর্থাৎ জীবন ধারণের প্রয়োজনে গ্রহণ করছি। তা খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ বা কোনোরূপ শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়। আমার এই আহার গ্রহণ ক্ষুধা ও রোগ নিবারণের জন্য। এ পরিমিত আহার বুদ্ধ প্রদর্শিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যম পথ অনুশীলনের জন্য গ্রহণ করছি।

শয্যাসন প্রত্যবেক্ষণ

শ্রমণগণ শয্যাসন সম্পর্কে এরূপ চিন্তা বা ভাবনা করেন : আমি অর্থ সংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে শয্যা এবং আসন গ্রহণ করছি। শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, মশা-মাছির দংশন, বায়ু, রৌদ্র, সরীসৃপ ও ঋতুজনিত নানা উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই শয্যাসন গ্রহণ করছি। কর্মস্থান ভাবনা ও একাগ্রতা সাধনার জন্য এ শয্যাসন গ্রহণ করছি। শুধু আলস্য বা নিদ্রা যাপন করে বৃথা সময় ক্ষেপণের জন্য নয়।

গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ

শ্রমণগণ গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ সম্পর্কে এরূপ চিন্তা বা ভাবনা করেন : আমি অর্থ সংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হয়ে রোগ উপশমের জন্য গিলান বা ঔষধ সেবন করি। নানা রকম দুঃখ দায়ক বেদনাসমূহ থেকে নিরাময় হওয়ার জন্য ঔষধ সেবন করি। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঔষধ সেবন করি না।

অনুশীলনমূলক কাজ

দশশীল পালনকারীকে কি কি ভাবনা করতে হয়? ব্যাখ্যা কর।

পাঠ : ৪

দশশীলের গুরুত্ব

চারিত্রিক শুদ্ধতাই ধর্ম চর্চার মূল ভিত্তি। শীলের লক্ষ্য হচ্ছে পাপের পঙ্কিল পথ পরিহার করে এবং পাপমূলে কুঠারাঘাত করে মানুষের চরিত্রকে সংযত, শুদ্ধ ও সুন্দর করা। তাই শীলকে মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে শীল সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে : পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষলতা

প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে তেমনি সাধকগণ শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাবনা করে থাকেন। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, 'শীলের দ্বারা সমাধি বৃদ্ধি পায়। সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়। প্রজ্ঞা পূর্ণ চিত্ত কামাসব, ভবাসব ও অবিদ্যাসব থেকে মুক্তি লাভ করে।' আসবমুক্ত চিত্ত চির প্রশান্তি লাভ করে। এ কারণে তথাগত বুদ্ধ মানব কল্যাণে শীলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং শীল লঙ্ঘনকে মহাপাপ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'দুঃশীল ব্যক্তির শতবর্ষের জীবন অপেক্ষা শীলবান ব্যক্তির একদিনের জীবন শ্রেয়ঃ।' শীল পালনের সুফল অনেক। যেমন : শীলবান ব্যক্তির মহাভোগ সম্পত্তি লাভ হয়। তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হন, সর্বত্র নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত হন, সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। এসব কারণ বিবেচনা করে বলা যায়, শীল পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে দশশীলের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো :

১. হিংসা, ক্রোধ ও ভোগস্পৃহার কারণে আঘাত এবং হত্যা করা হয়। দশশীলের প্রথম শীলটি এসব অমানবিক প্রবৃত্তি দূর করে এবং সর্বপ্রাণির প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন করে তোলে।

২. লোভ, মোহ ও তৃষ্ণা বশত মানুষ অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে। দ্বিতীয় শীলটি এ অশুভ মনোবৃত্তিসমূহ দূর করে এবং নিজের পরিশ্রম লব্ধ বস্তু ভোগ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. অসংযত ইন্দ্রিয় বা কাম লালসার কারণে মানুষ অব্রহ্মচর্যা আচরণ করে। তৃতীয় শীলটি ইন্দ্রিয় দমন করে অনৈতিক কামাচার পরিত্যাগ করতে এবং বুদ্ধ নির্দেশিত ব্রহ্মচর্যা পালনে উৎসাহী করে।

৪. মিথ্যা, কটু, অসারকথা প্রভৃতি ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করে এবং মানুষকে দুঃখ দেয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নষ্ট করে। চতুর্থ শীল এসব থেকে বিরত রেখে সত্য, সংযত ও সারযুক্ত কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. মাদকদ্রব্য মানুষের স্মৃতি এবং হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে। মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। শ্রামণ্য জীবনের পরিপন্থী অনৈতিক কাজে প্রলুব্ধ করে। পঞ্চমশীল এসব কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করে সুস্থ ও স্মৃতিময় জীবন যাপনে সহায়তা করে।

৬. অপরিমিত ভোজন ইন্দ্রিয়কে অসংযত ও উত্তেজিত রাখে। ইন্দ্রিয় লিপ্সা মানুষকে অনৈতিক কামাচার ও অতিরিক্ত ভোগ স্পৃহায় প্রলুব্ধ করে। ষষ্ঠ শীল ইন্দ্রিয় দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংযত জীবন যাপন এবং ধ্যান-সমাধিতে অধিক মনোনিবেশ করতে প্রেরণা যোগায়। তাছাড়া অভুক্ত মানুষের ক্ষুধার জ্বালা-যন্ত্রণা বুঝতে ও তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিক্ষা দেয়।

৭. নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত করে। ভোগ-লালসা ও কামোদ্দীপক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে বিচ্যুত করে। সপ্তম শীল শান্ত-সংযত জীবন গঠনে ভূমিকা রাখে।

৮. মাল্যধারণ, সুগন্ধ প্রসাধনী লেপন ও নানা রকম গহণা পরিধান ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্ত করে তোলে। ভোগ-বিলাস ব্রহ্মচর্য আচরণের পথে বড় অন্তরায়। অষ্টম শীল ভোগ-বিলাসের আসক্তি বিদূরিত করে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

৯. বিলাসবহুল শয়নাসন মানুষকে আরামপ্রিয়, অলস ও উদ্যম হীন করে তোলে। নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম বা সম্যক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। নবম শীল অলসতা ও আরামপ্রিয়তা দূর করে উদ্যমশীল করে তোলে।

১০. কথায় বলে অর্থ অনর্থের মূল। স্বর্ণ-রৌপ্য অর্থ সম্পদ মানুষের তৃষ্ণা বর্ধিত করে। তৃষ্ণা দুঃখের মুল কারণ। দশম শীল তৃষ্ণা ক্ষয় করে এবং দুঃখ মুক্ত করে পরম শান্তি নির্বাণের পথে উপনীত করে।

মানবতা ও নৈতিকতার সব বৈশিষ্ট্য দশশীলের মধ্যে নিহিত আছে। ফলে দশশীলের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা সহজে বোধগম্য।

পাঠ : ৫

দুঃশীলতার ফল

যাঁরা শীল পালন করেন তাঁদের শীলবান বলা হয়। অপরদিকে যারা শীল পালন করে না তাদের দুঃশীল বলা হয়। দুঃশীল ব্যক্তি দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়। তারা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত থাকে। বিবেক বোধ হারিয়ে ফেলে। ফলে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে না। পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শান্তি বিনষ্ট করে। তারা নিজের এবং অপরের ক্ষতি সাধন করে। নিচে দুঃশীলতার কতিপয় ফল তুলে ধরা হলো :

১. দুঃশীল ব্যক্তি প্রমাদের বা অলসতার বশবর্তী হয়ে স্বীয় সম্পত্তি বিনষ্ট করে।

২. অকুশল কাজের জন্য তারা সর্বত্র নিন্দিত হয়।

৩. সভা সমাবেশে সংঙ্কোচ বোধ করে এবং মৌন থাকে।

৪. মোহাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৫. মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

এসব কারণ বিবেচনা করে দুঃশীলতা পরিহার করে সকলের শীল পালন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

আরো পাঁচটি দুঃশীলতার ফল বল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। শ্রমণদের নিত্য পালনীয় শীল কোনটি ?

ক. পঞ্চশীল খ. অষ্টশীল

গ. দশশীল ঘ. প্রাতিমোক্ষশীল

২। বুদ্ধ প্রশংসিত দশশীল পালন করা উচিত কারণ এতে –

i. পরজন্মে মুক্তির পথ সুগম হয়

ii. বুদ্ধশাসন সজীব হয়

iii. বিশুদ্ধ ও অনাসক্ত জীবন যাপন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

দায়ক : ওকাস অহং ভন্তে তিসরনেন সদ্ধিং পব্বজ্জা

দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

ভন্তে : ক্রমানুসারে বলেন –

১। পাণাতিপাতা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিযামি

২। .....

৩। (?)

৪। .....

৫। .....

৬। বিকাল ভোজনা বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিযামি

৭। .....

৮। .....

৯। .....

১০। জাত-রূপ-রজত পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

৩। ভন্তের উচ্চারিত '?' চিহ্নিত শীলের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

ক. কামেসু মিচ্ছাচারা খ. অব্রহ্মচরিযা

গ. মুসাবাদা ঘ. সুরা মেরেয মজজ পমাদ্‌টঠানা

৪। উক্ত শীল কাদের জন্য প্রযোজ্য ?

ক. সাধারণ গৃহীদের খ. দায়ক-দায়িকাদের

গ. ভিক্ষু-শ্রমণদের ঘ. উপাসক-উপাসিকাদের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শুভ্রনীল বড়ুয়া ও সাগর বড়ুয়া দুই ভাই। তাদের পিতামাতা একদিন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তাদেরকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা দেন। শুভ্রনীল বড়ুয়া শ্রামণ্যনীতি অনুসরণ করে দশশীলের গুণাবলি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন। অপরদিকে সাগর বড়ুয়া শ্রমণদের নিত্য পালনীয় শীল পালন না করে বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা শোনা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার ও টাকা-পয়সা গ্রহণ করতে থাকে।

ক. বুদ্ধ নির্দেশিত কয় প্রকার আর্যসত্য রয়েছে ?

খ. দশশীলের সপ্তম শীলটি ব্যাখ্যা কর।

গ. সাগর বড়ুয়ার আচরণ কোন শীলের নীতি বিরোধী ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত শীল পালন করে শুভ্রনীল বড়ুয়া ইহ ও পরকালে কী সুফল ভোগ করবে ? বিশ্লেষণ কর।

২। বিনয়ানন্দ শ্রমণ মানিকছড়ি ভাবনা কেন্দ্রে গিয়ে ধ্যান চর্চা করতে থাকেন। সেখানে তিনি শ্রামণ্যশীল পালন করে চীবর প্রত্যবেক্ষণ, পিন্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ, শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ ও গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ - এই চার প্রকার প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে থাকেন। এতে তাঁর চিত্ত সমাহিত হয়।

ক. শ্রমণ শব্দের অর্থ কী ?

খ. দুঃশীল ব্যক্তি কীরূপ ফল লাভ করে? বর্ণনা কর।

গ. বিনয়ানন্দ শ্রমণ কোন ভাবনা করেছেন পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বিনয়ানন্দ শ্রমণ পালনীয় শীলের গুরুত্ব অত্যধিক' – এ বক্তব্যের সাথে তুমি কী একমত, যুক্তি দেখাও।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. শীল কুশল ধর্মের . . . বা . . .।

২. শীল পালনে মনের . . . নির্বাপিত হয়ে শীতল হয়।

৩. প্রব্রজ্যা জীবন . . . ও . . . বাসনা মুক্ত।

৪. . . . ভাবনা দশশীল পালনকারী শ্রমণের অবশ্য করণীয়।

৫. শীলকে মানব জীবনের . . . . . হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৬. দুঃশীল ব্যক্তি . . . . . বশবর্তী হয়ে স্বীয় সম্পত্তি বিনষ্ট করে ।

৭. মাদক দ্রব্য মানুষের . . . . . এবং . . . . . জ্ঞান নষ্ট করে ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শীলের অপর নাম কী এবং কেন?

২. পিন্ড-পাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার সময় কীরূপ চিন্তা বা ভাবনা করতে হয়?

৩. শীলের লক্ষ্য কী?

৪. দুঃশীল ব্যক্তির চরিত্র কেমন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দশশীল পালিতে লেখ ।

২. দশশীলের বাংলা অনুবাদ লেখ ।

৩. দশশীলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

৪. দুঃশীলতার কুফল বর্ণনা কর ।

৫. দশশীল পালনকারীদের কি কি ভাবনা করতে হয় ।

চতুর্থ অধ্যায়

দান

'দান' একটি মহৎ মানবীয় গুণ। নিঃস্বার্থভাবে যা দেয়া হয় তা-ই দান। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের উপকারের জন্য যিনি দান কার্য সম্পাদন করেন, তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি। বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দান পারমী পূর্ণ না করলে নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। তথাগত বুদ্ধ 'বুদ্ধত্ব' লাভের জন্য দশ পারমীর মধ্যে দান পারমীকেই প্রথম স্থান দিয়েছেন। ধনীরাই দান করতে পারেন তা নয়, চিত্তের উদারতা থাকলে গরিবরাও দান করতে পারে। অনেক বিত্তহীন ব্যক্তি শুধু চিত্তের উদারতার কারণে দান করে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দান করার ক্ষেত্রে পাত্র-অপাত্র, দানীয় বস্তু ও মানসিক অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করতে হয়। দান একটি কুশল কর্ম। অন্যান্য কুশলকর্মের মতো দানেরও সুফল বা প্রভাব আছে। এ অধ্যায়ে আমরা দানের বিবেচ্য বিষয়, তিনটি দান কাহিনী এবং দানের প্রভাব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* বৌদ্ধ দান কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।
* দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করতে পারব।
* দানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়। তাই কোনো কাজ করার পূর্বে কর্মফল সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। বৌদ্ধধর্মে নিঃস্বার্থভাবে কোনো কিছু ত্যাগ করলেই দান হয় না, দান দিতে হলে দানীয় বস্তু, দাতা ও দানের ক্ষেত্র বা গ্রহীতার বিষয়ে বিবেচনা করতে হয়। দানের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে সংক্ষিপ্তভাবে জানব।

বৌদ্ধধর্মে দানীয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যথা : ১। বস্তু সম্পত্তি ২। চিত্ত সম্পত্তি ৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

১। বস্তু সম্পত্তি :

বৌদ্ধধর্মে সৎ-উপায়ে অর্জিত বা লব্ধ টাকা-পয়সা বা বস্তুকে বস্তু সম্পত্তি বলা হয়। অর্থাৎ দানীয় বস্তুটি ন্যায়সম্মতভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা। অসদুপায়ে লব্ধ টাকা-পয়সা বা বস্তু দান করা উচিত নয়। এরূপ দানকে মিশ্রদান বলে। মিশ্রদান হীন দান। দানীয় বস্তু তিন প্রকার। যথা : আমিষ দান, অভয় দান ও ধর্ম দান। আমিষ দান দুই প্রকার : বাহিরের বস্তু ও ভিতরের বস্তু। বাহিরের বস্তু হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, বাসস্থান, পরিষ্কার করার জিনিস, ধুপ, বাতি, যানবাহন, ঔষধ, বাড়ি, প্রাসাদ, কুটির, বিহার ইত্যাদি

নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ভিতরের বস্তু হচ্ছে - নিজের হাত, পা, চোখ, কিডনি, হৃৎপিণ্ড, রক্ত, চর্ম ইত্যাদি যা গ্রহীতার নিশ্চয়ই উপকারে আসবে জেনে দাতা দান করে থাকেন। হিংসার বশবর্তী হয়ে ক্ষতি করার জন্য যদি কেউ দানীয় বস্তুগুলো প্রার্থনা করে তখন তা দান করা উচিত নয়।

অভয় দান : অভয় দান হল নিরাশ্রয়, বিপদাপন্ন, অসহায় মানুষ ও প্রাণীকে আশ্রয়, নির্ভরতা, সেবা প্রভৃতি দান করা যাতে সে নিরাপদ হয়।

ধর্ম দান : ধর্ম দান হল মৈত্রী দান, পুণ্য দান, জ্ঞান দান প্রভৃতি। ধর্ম দান অর্থাৎ নৈতিকতার পথে আসতে সাহায্য করা।

বৌদ্ধধর্মে দান করার ক্ষেত্রে বস্তু সম্পত্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত।

২। চিত্ত সম্পত্তি :

বুদ্ধ চেতনাকে কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চিত্তের কুশল চেতনা কুশল কর্ম, অকুশল চেতনা অকুশল কর্ম হিসেবে অভিহিত। চেতনায় কুশল কর্ম যত চিন্তা করা যায়, ততই পুণ্য বৃদ্ধি পায়। দান দেয়ার পূর্বে সন্তুষ্ট চিত্ত থাকা, দান দিয়ে চিত্তকে প্রসন্ন করা এবং দেয়ার পরও চিত্তে অপার আনন্দ উৎপন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই দান দেয়ার পূর্বে, দান দেয়ার সময় এবং দান দেয়ার পর চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত থাকা এবং কুশল চেতনা যুক্ত থাকা উচিত। তাই বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করে অতি শান্ত ও পবিত্র মনে উদার চিত্তে দান করা উত্তম।

দানের ক্ষেত্রে যিনি কুশল চিত্তে দান করেন শুধু তিনিই যে পুণ্য ফল অর্জন করেন তা নয়, অন্যরা যাঁরা ঐ দান অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা ও উদার চিত্তে অংশগ্রহণ করেন এবং সাধুবাদের সঙ্গে দান অনুমোদন করেন তাঁরাও পুণ্যফল অর্জন করেন। দান চর্চার বিষয়। ধন-সম্পদ থাকলেও সবাই দান করতে পারে না। এর কারণ চিত্তের উদারতা ও কুশল চেতনার অভাব। চিত্তের এই অবস্থাকে চিত্তসম্পত্তি বলা হয়। প্রত্যেকের দান অনুশীলন করা উচিত।

৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি :

বৌদ্ধধর্ম মতে, দানের ফল নির্ভর করে দান গ্রহীতার চারিত্রিক শুদ্ধিতার উপর। তাই দান দেয়ার পূর্বে দান গ্রহীতা সম্পর্কেও বিচার বিবেচনা করা উচিত। বিবেচনা না করে দান দিলে উল্টো ফলও হতে পারে। যেমন, যদি একজন নিষ্ঠুর ডাকাতকে অর্থ দান করা হয়, সে তা দিয়ে মারণাস্ত্র কিনে মানুষ হত্যা করতে পারে। এমনকি দাতাকেও হত্যা করতে পারে। তাই দানগ্রহীতা সম্পর্কে বিবেচনা করে দান দেয়া উচিত। দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রকে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলা হয়।

দানের ক্ষেত্রে সময় ও গ্রহীতার সঠিক প্রয়োজনও বিবেচনা করা উচিত। গ্রহীতার প্রয়োজন বিবেচনা করে দান করলে সেই দানকে 'কালদান' বলা হয়। গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে দান করলে এতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হয়।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ হচ্ছে দানের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র। বুদ্ধ বর্তমান থাকলে তাঁকে দান করলে সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যায়। সদ্ধর্মের প্রচার-প্রসারে দান করলে তা উৎকৃষ্ট দান হয়। কারণ সদ্ধর্ম মানুষকে নৈতিক ও দুঃখ মুক্তির পথে পরিচালিত করে। শীলবান ভিক্ষুসংঘও দানের উত্তম পাত্র। শীলবান ভিক্ষুগণ সদ্ধর্মের ধারক-বাহক। এছাড়া শীলবান অথচ ভিক্ষু নন এমন ব্যক্তিকেও তাঁর উপকারার্থে দান করা যায়। পশু, পাখি, সরীসৃপ, পোকা ইত্যাদিকেও দান করা যায়। স্বর্গ ও নরকবাসী মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশে দান করা যায়। এই দানেও শতসহস্র গুণ পুণ্যফল অর্জিত হয়।

দাতা ও গ্রহীতা :

কোনো কোনো দান দাতার দ্বারা মহাফলপ্রদ হয় অথচ গ্রহীতার দ্বারা হয় না। আবার কোনো কোনো দান গ্রহীতার দ্বারা মহাফলপ্রদ হয়, কিন্তু দাতার দ্বারা হয় না। কোনো কোনো দান দাতা ও গ্রহীতা কোনো পক্ষের দ্বারা মহাফলপ্রদ হয় না। আবার কোনো কোনো দান দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষের দ্বারা মহাফলপ্রদ হয়।

শীলবান দায়ক যদি দুঃশীল গ্রহীতাকে দান করে, তা দায়কের শীলগুণ প্রভাবে মহাফলপ্রদ হয়। শীলবান রাজা বেস্‌সান্তর যেমন যোজক ব্রাহ্মণকে দান দিয়ে পৃথিবী কম্পিত করেছিলেন। দুঃশীল দায়ক যদি শীলবান গ্রহীতাকে দান করে, তা গ্রহীতার দ্বারা মহাফলপ্রদ হলেও দায়কের দ্বারা নহে। দাতা গ্রহীতা উভয়ে দুঃশীল হলে সেই দান কোনো পক্ষ হতেই মহাফলদায়ী হয় না। দাতা-গ্রহীতা উভয়ে যদি শীলবান হয়, তবে উভয়পক্ষের শীলগুণে সেই দান মহাফলপ্রদ হয়ে থাকে।

এজন্যই দান সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয় -

যো সীলবা সীলবন্তেসু দদাতি দানং
ধম্মেন লদ্ধং সুপ্পসন্ন চিত্তো,
অভিসদ্ধ'হং কম্মফলং উলারং
তংবে দানং বিপুল ফলন্তি ব্রূমি

বাংলা অনুবাদ : যে শীলবান ধর্ম দ্বারা উপার্জিত বস্তু উদার কর্মফল শ্রদ্ধাসহ সুপ্রসন্ন চিত্তে শীলবানকে দান দিয়ে থাকে, আমি বলি, সে দান নিশ্চয়ই বিপুল ফল প্রদান করে থাকে (কারণ তা দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের শীল গুণ দ্বারা বিশুদ্ধ)।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

দানীয়বস্তুর একটি তালিকা তৈরি কর।

'কালদান' কাকে বলে।

পাঠ : ২

দান কাহিনী

কাহিনী : ১

গৌতম বুদ্ধ পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারতেন। শিষ্য এবং উপাসকদের উপদেশ দেওয়ার সময় তিনি প্রায়ই তাঁর পূর্বজন্মের কুশলকর্মের নানা কাহিনী বর্ণনা করতেন। এই কাহিনীগুলো জাতক নামে পরিচিত। জন্ম-জন্মান্তরে বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি নানা কুলে জন্মগ্রহণ করে পারমীসমূহ পূর্ণ করেছিলেন। প্রতিটি জন্মে তিনি বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় তিনি অনেক দান করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে বোধিসত্ত্বের অনেক দান কাহিনী আছে। এখন এরূপ একটি দান কাহিনী পড়ব।

একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি চারটি সিদ্ধ যব কিনে নিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন। ঐ সিদ্ধ যবগুলো ছিল তাঁর খাদ্য। কাজে যাওয়ার পথে তিনি চারজন প্রত্যেকবুদ্ধের দেখা পেলেন। তাঁরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হয়েছিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ শীলবান ছিলেন। তাঁদের দেখে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধ যবগুলো দান দেবেন বলে স্থির করলেন। তিনি তখন তাঁদের বন্দনা করে দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দাতার আগ্রহ দেখে প্রত্যেকবুদ্ধগণ দান গ্রহণে সম্মত হলেন। বোধিসত্ত্ব পরিষ্কার স্থানে চারটি আসন প্রস্তুত করে তাতে বুদ্ধগণের বসার ব্যবস্থা করলেন এবং স্বহস্তে সিদ্ধ যবগুলো তাঁদের আহারের জন্য দান করলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ দান অনুমোদন করলেন। দান অনুমোদনের পরে বোধিসত্ত্ব প্রত্যেকবুদ্ধগণের নিকট প্রার্থনা করলেন যে, এই দানের ফলে তিনি যেন পরবর্তী জন্মে দরিদ্র ঘরে জন্মলাভ না করেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ প্রার্থনা অনুমোদন করে আশীর্বাদ করলেন। বোধিসত্ত্ব দানজনিত প্রীতি অনুভব করলেন।

বোধিসত্ত্ব যতদিন বেঁচেছিলেন ততোদিন এই দানের কথা স্মরণ করতেন। মৃত্যুর পর তিনি বারাণসীর রাজার পুত্ররূপে পুনরায় জন্মলাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় ব্রহ্মদত্ত কুমার। বড় হয়ে তিনি তক্ষশীলায় গিয়ে সর্ববিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করলেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজা হয়ে কোশল রাজার পরমা সুন্দরী কন্যাকে অগ্রমহিষী করলেন। এই অগ্রমহিষী পূর্বজন্মে শীলবতী নারী ছিলেন। দাসীবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করলেও তিনি সচ্চরিত্র সম্পন্ন ছিলেন। একদিন তিনিও বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নিজের খাদ্য সন্তুষ্ট চিত্তে আনন্দের সঙ্গে দান করেছিলেন। সেই দানফলে তিনি পরজন্মে কোশল রাজকন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিয়ষীর পদ লাভ করেন। রাজা ও রানি উভয়েই অত্যন্ত দানশীল ছিলেন এবং ছয়টি দানশালা স্থাপনের মাধ্যমে তাঁরা দান কর্ম করতেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

গল্পে বর্ণিত দান কাহিনীর বিশেষত্ব চিহ্নিত কর।

কাহিনী : ২

রাজা বেস্‌সান্তর অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। একবার একজন দুঃশীল পাপী ব্রাহ্মণ তাঁর দানধর্ম পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সন্তানদের ভিক্ষা চাইলেন। শীলবান রাজা বেস্‌সান্তর উদার ও প্রসন্ন চিত্তে পাপী ব্রাহ্মণকে ছেলে-মেয়ে দান করেছিলেন। তাঁর এই দানের মহীমায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। রাজা বেস্‌সান্তর দুঃশীল যোজক ব্রাহ্মণের অকুশল বাসনা সম্পর্কে জানতেন না। তিনি রাজাকে প্রবঞ্চনা করতে এসেছিলেন। কিন্তু শীলবান রাজা তাঁর উদার দানধর্ম থেকে বিরত হননি। তিনি নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় সন্তানদের দুঃশীল ব্রাহ্মণের হাতে দান করলেন। ব্রাহ্মণ যখন সন্তানদ্বয়কে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলেন তখন হঠাৎ রক্তবমি করতে লাগলেন এবং ঐখানেই প্রাণ ত্যাগ করলেন। রাজা সন্তানদের ফিরে পেলেন। তাঁর দানের মহত্ব বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, উদার ও প্রসন্ন চিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে দুঃশীল ব্যক্তিকে দান করলে সেই দান দাতার গুণ দ্বারা বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধতা প্রাপ্তি অর্থ মহাফলদায়ক যা মহা পুণ্য লাভের কারণ।

রাজা বেস্‌সান্তর ব্রাহ্মণকে সন্তান দান করছেন

কাহিনী : ৩

আরেকবার কল্যাণ নদীর তীরে বসবাস করত এক জেলে। নদীর মাছ শিকার করে সে জীবিকা অর্জন করত। এই জেলে দীঘসোম স্থবির নামে একজন শীলবান ভিক্ষুকে তিনবার পিণ্ডদান করেছিলেন। শেষ জীবনে এবং

মৃত্যুর সময়েও ঐ জেলে তাঁর দানময় অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতেন। তিনি চিন্তা করতেন, "আমি আর্য দীঘসোম স্থবিরকে যে পিণ্ডদান দিয়েছিলাম তা আমার অনেক পুণ্য অর্জনের এবং পাপ ক্ষয়ের কারণ হয়েছে।" এই দান ও কুশল কর্মের চেতনার ফলে তিনি অনেক পুণ্যফল অর্জন করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রতিগ্রাহকের গুণে দান মহাফল প্রদান করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

দান কাহিনী ২ এবং ৩-এর শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা কর

পাঠ : ৩

দানের প্রভাব

দানের প্রভাব অপরিসীম। সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও কঠিন চীবর দান ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সমবেতভাবে শীলময়, দানময় ও ভাবনাময় চিত্তে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘকে দান করে থাকি। দান ব্যক্তি, সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনের উৎকর্ষতা সাধন করে। নিম্নে ব্যক্তি, সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনে দানের প্রভাব আলোচনা করা হলো।

ব্যক্তি জীবনে দানের প্রভাব : দান মানুষের মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। দান দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ যেমন বিদূরিত হয়, তেমনি মৈত্রী, করুণা, পরোপকারী মনোভাব, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়। এসব গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তি মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। ফলে আত্মতুষ্টি ও আনন্দ লাভ করেন। সর্বত্র প্রশংসিত ও পূজিত হন। তাঁর কীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভালো বন্ধু লাভ করেন। কখনো বিপদ ও অভাব গ্রস্থ হন না।

সমাজ জীবনে প্রভাব : দানশীল ব্যক্তির দান দ্বারা সমাজে অনেক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট মেরামত ও উন্নয়ন, কন্যা দায়গ্রস্থ অভিভাবক ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে সহায়তা, কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টি, জলাধার স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দান করলে সমাজের উন্নয়ন ও বহুজনের উপকার সাধিত হয়। রক্ত দান, চোখ দান ও অন্যান্য অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা দান অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ জীবনযাপনে আশা জাগায়, দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফিরে পেতে সাহায্য করে। ধর্মীয় দানানুষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। ফলে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

ধর্মীয় জীবন গঠনে দানের প্রভাব : নির্বাণ লাভ করতে হলে দশপারমী পূর্ণ করতে হয়। দশপারমীর মধ্যে দান পারমীর স্থান সর্বাগ্রে। লোভ- দ্বেষ-মোহের কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল কারণ। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে। তৃষ্ণাকে ক্ষয় করতে পারলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। দানের ফলে লোভ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত হয়। তৃষ্ণার ক্ষয় হয়। তৃষ্ণা মুক্ত মানুষ আর জন্মগ্রহণ করেন না। ফলে মানুষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে নির্বাণের পথে অগ্রসর হন। দান পারমী পূর্ণকারী ব্যক্তি স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ব ফল লাভ করেন। এভাবে দান ধর্মীয় জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দান কি ?

ক. কুশল কর্ম
খ. সাধনার
গ. প্রজ্ঞা
ঘ. ত্যাগ

২। কর্ম অনুযায়ী মানুষ ফল ভোগ করে –

i. কুশল কর্মের কুশল ফল
ii. অকুশল কর্মের ফল অকুশল
iii. কর্মফল সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কাজল বড়ুয়া পশু-পাখির ব্যবসা করেন। তিনি একদা শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে সংঘদানের ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘদিন ব্যবসা করার পর হঠাৎ তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। তিনি মৃত্যুর সময়েও উক্ত দানের কথা স্মরণ করেন।

৩। কাজল বড়ুয়া সংঘদান চেতনায় কোন সম্পত্তির প্রতিফলন ঘটেছে ?

ক. বস্তুসম্পত্তি
খ. চিত্তসম্পত্তি
গ. প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি
ঘ. ভোগসম্পত্তি

৪। কাজল বড়ুয়ার সংঘদানের কুশল চেতনায় লাভ করতে পারেন –

i. পুণ্যফল ভোগ
ii. মহাফল ভোগ
iii. পাপ মোচন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অর্ণব চাকমার মা পক্ষাঘাতজনিত কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতালে শয্যাশায়ী। মায়ের রোগমুক্তির জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারের ব্যবস্থা করেন এবং অষ্ট পরিষ্কার দানও করেন। তাঁর মায়ের প্রতি এরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে শ্রদ্ধেয় বিহারাধ্যক্ষ দেশনায় সকলের নিকট তাঁর প্রশংসা করেন।

ক. বৌদ্ধধর্মে দানীয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রধানত কয়টি বিষয়ে বিবেচনা করতে হয় ?

খ. মিশ্রদান বলতে কী বোঝায় ?

গ. অর্ণব চাকমার দানের ঘটনাতে দাতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দানের প্রভাবে চিত্তকে পরিশুদ্ধ ও ফলপ্রসূ করতে দাতা-গ্রহীতার কিরূপ ভূমিকা প্রয়োজন – পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।

২। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কৃষিকাজ করে রিক্ত চাকমার সংসার চালানো খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তবে তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর দান করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজের চাপে পুণ্য কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হন। একদা কয়েকজন ভিক্ষু পিণ্ডাচরণের উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে আগমন ঘটলে তিনি কালবিলম্ব না করে পূর্বের রান্নাকৃত ভাত ও তরকারি দান করেন । এতে তিনি খুবই খুশি হন।

ক. গৌতমবুদ্ধ চেতনাকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ?

খ. রাজা বেস্‌সান্তর তার পুত্র সন্তানদের দান করলেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. রিক্ত চাকমার দানটি পাঠ্যপুস্তকের কোন কাহিনীর সাথে মিল রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত দান চেতনায় তাঁর ধর্মীয় জীবনে কীরূপ প্রভাব পড়তে পারে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. দান পারমী পূর্ণ না করলে . . . . . লাভ সম্ভব নয়।

২. বোধিসত্ত্ব স্বহস্তে . . . . . দান করলেন।

৩. রাজা বেসসান্তর অত্যন্ত . . . . . ছিলেন।

৪. কল্যাণ নদী তীরে বসবাস করত এক . . . . . ।

৫. দানীয় বস্তু . . . . . প্রকার।

মিলকরণ

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

বাম	ডান
১. কর্ম অনুযায়ী	বিচার-বিবেচনা করা
২. দানীয় বস্তু সম্বন্ধে	মানবীয় গুণ
৩. দান একটি মহৎ	ফল ভোগ করতে হয়
৪. বুদ্ধ চেতনাকে	প্রীতি অনুভব করলেন
৫. বোধিসত্ত্ব দানজনিত	কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

১. দানের ক্ষেত্রে কি কি বিবেচনা করতে হয়?

২. 'কালদান' কী?

৩. দানশীল ব্যক্তি সমাজে কীভাবে মূল্যায়িত হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দানের ধর্মীয় গুরুত্ব আলোচনা কর।

২. তিন প্রকার দানের বর্ণনা দাও।

৩. দানের উপযুক্ত পাত্র কে? আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

তথাগত বুদ্ধ বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণের মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দান করতেন। সূত্রপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব সূত্র ও নীতিগাথা পাওয়া যায়। এসব সূত্র ও নীতিগাথা মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে এবং পরিবার ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই অধ্যায়ে আমরা দুটি সূত্র পাঠ করব। সূত্র দুটি হলো পরাভব সূত্র ও কলহ বিবাদ সূত্র।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* পরাভব সূত্র এবং কলহ-বিবাদ সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।
* মানব জীবনের পরাজয় ও কলহ বিবাদের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
* পরাভব এবং কলহ বিবাদ সূত্র পাঠে কীভাবে নৈতিক জীবন গঠন করা যায় তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
* পরাভব ও কলহ-বিবাদ হতে বিরত থাকার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

পরাভব সূত্রের পটভূমি

একবার দেবতাগণের অনুরোধে তথাগত বুদ্ধ মানুষ ও প্রাণীর কীসে মঙ্গল হয় তা বর্ণনা করে মঙ্গল সূত্র দেশনা করেন। দেবতারা মঙ্গলসূত্র শুনে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তাঁরা চিন্তা করলেন, আমরা কেবল মঙ্গল সম্পর্কেই জেনেছি। কেন মানুষের পরাভব বা অমঙ্গল হয় তা জানি না। অতঃপর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, পুনরায় বুদ্ধের কাছে গিয়ে কেন মানুষের পরাভব হয় তা জানবেন। এরূপ ভেবে তাঁরা পুনরায় বুদ্ধের নিকট গেলেন। তখন তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারে বসবাস করছিলেন। তাঁরা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক মানুষের পরাভবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান বুদ্ধ মানুষের পরাজয়ের সঠিক কারণগুলি যে সূত্রে উল্লেখ করেন তার নাম 'পরাভব সূত্র'। সূত্রটি 'খুদ্দক নিকায়'-এর অন্তর্গত সুত্তনিপাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

পরাভব সূত্রটি বুদ্ধ কাদের উদ্দেশ্যে দেশনা করেছিলেন?

পরাভব সূত্র কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে?

বুদ্ধ দেবতাদের উদ্দেশ্যে পরাভব সূত্র দেশনা করছেন

পাঠ : ২

পরাভব সূত্র (পালি ও বাংলা)

১। সুবিজানো ভবং হোতি, অবিজানো পরাভবো,

ধম্মকামো ভবং হোতি, ধম্মদেস্সী পরাভবো।

বাংলা অনুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তির জয় হয় এবং অজ্ঞানীর পরাজয় ঘটে, ধর্মানুরাগীর জয় হয় কিন্তু ধর্ম বিদ্বেষীর পরাজয় হয়।

২। অসন্তস্স পিযা হোন্তি, সন্তে ন কুরুতে পিযং,

অসতং ধম্মং রোচেতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : অসৎ যার প্রিয়, সৎ যার অপ্রিয়, এবং অধর্ম যার প্রিয় তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৩। নিদ্দাসীলি সভাসীলি, অনুট্ঠাতা চ যো নরো,

অলসো কোধপঞ্ঞানো, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যে খুব ঘুমায়, বন্ধুদের সংগে অনেকক্ষণ গল্প করে সময় কাটায়, অলস, উদ্যমহীন ও রাগী তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৪। যো মাতরং বা পিতরং বা, জিণ্ণকং গতযোব্বনং,

পহুসন্তো ন ভরতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যে নিজে সুখে থেকে বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ-পোষণ করে না তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৫। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা, অঞ্ঞঞং বাপি বনিব্বকং,

মুসাবাদেন বঞ্চেতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ অথবা অন্য অসহায় লোককে মিথ্যা কথা বলে বঞ্চনা করে তার পরাজয় ঘটে।

৬। পহুতবিত্তো পুরিসো- সহিরঞ্ঞো সভোজনো,

একো ভুঞ্জতি সাদুনি- তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যার অনেক ধনসম্পত্তি থাকতেও অন্যকে বিন্দুমাত্র দান করে না বা দেয় না, নিজেই একা ভোগ করে তার পরাজয় ঘটে থাকে।

৭। জাতিত্থদ্ধো ধনত্থদ্ধো, গোত্তত্থদ্ধো চ যো নরো,

সং ঞ্ঞাতিং অতিমঞ্ ঞাতে, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যে জাতিগর্বে, ধনগর্বে ও কুলগর্বে নিজের জ্ঞাতিদের অবজ্ঞা করে তার পরাজয় হয়ে থাকে।

৮। ইত্থিধুত্তো সুরধুত্তো, অক্খধুত্তো চ যো নরো,

লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়ে এবং মাদক ও জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে যা রোজগার করে তা ব্যয় করে তার পরাজয় ঘটে।

৯। অতীত যোব্বনো পোসো, আনেতি তিম্বরুত্থনিং,

তস্‌সা ইস্‌সা ন সুপতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যে বৃদ্ধ তরুণী কন্যা বিবাহ করে এনে, ঈর্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে পরাজয়ের কারণ হয়।

১০। ইত্থি সোণ্ডীং বিকিরণিং, পুরিসং বাপি তাদিসং,

ইসসরিযস্মিং ঠপেতি্, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : মাদকসেবনকারী, অনর্থক অর্থ ব্যয়কারী স্ত্রী বা পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিযুক্ত করলে তা পরাজয়ের কারণ হয়।

১১। অপ্‌পভোগো মহাতণ্‌হো, খত্তিযে জাযতে কুলে,

সো চ রজ্জং পত্থযতি, তং পরাভবতো মুখং।

বাংলা অনুবাদ : যে ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম নিয়েও দরিদ্র ও হীনবল অথচ তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি এবং এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে সে রাজ্য পাওয়ার ইচ্ছা করে তার পরাজয় ঘটে থাকে।

১২। এতে পরাভবে লোকে, পণ্ডিতো সমবেক্‌খিয,

অরিযদস্‌সন সম্পন্নো, সলোকং ভজতে সিবন্তি।

বাংলা অনুবাদঃ পরাজয়ের ঐসব কারণ বুঝে যিনি ঐ সকল কর্ম বর্জন করে কুশল কাজসমূহ সম্পাদন করেন তাঁর কখনো পরাজয় হয় না।

অনুশীলনমূলক কাজ

পরাজয়ের কারণগুলি দলগত আলোচনার পরে উপস্থাপন কর।

পাঠ : ৩

পরাভব সূত্রের তাৎপর্য

পরাভব বলতে এই সূত্রে পরাজয় বা পতন বোঝানো হয়েছে। নানা অকুশলকর্ম করার জন্য মানুষের পতন বা ক্ষতি হয়ে থাকে। ভ্রান্ত দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ সত্যিকারের পরাজয় বা পতন চিহ্নিত করতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যাকে পরাজয় মনে করে তা আসলে পরাজয় নয়। অসৎ সঙ্গীর সঙ্গে মিশতে না দিলে অনেক সময় মনে রাগ হয়, নিজেকে অজ্ঞতাবশত পরাজিত মনে হয় কিন্তু অসৎ সঙ্গই পরাজয় ঘটায়। সৎসঙ্গ মানুষের উপকার সাধন করে। অলস ব্যক্তির পরাজয় ঘটে। জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে না। জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির সর্বত্র জয় হয়, সাফল্য অর্জিত হয়। অকুশল বা অসৎভাবে অর্জিত সম্পদ মানুষের পরাজয়

ঘটায়। মাদক সেবন করলে অর্থ, স্বাস্থ্য, সম্মান ও জীবন নাশ হয়। মাদকসেবীর পরাজয় বা পতন ঘটে। অন্যায় লোভ ও আকাঙ্ক্ষা পরাজয়ের কারণ। এভাবেই বুদ্ধ পরাজয়ের যথোপযুক্ত কারণসমূহ 'পরাভব সূত্রে' ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরাজয়ের ঐ সব কারণসমূহ বর্জন করে চলেন, ফলে তাঁদের সাফল্য বা জয় হয়। আমাদেরও উচিত এই সূত্রে বর্ণিত পরাজয়ের কারণসমূহ বর্জন করে কুশলকর্ম সম্পাদনপূর্বক সৎপথে জীবন পরিচালনা করা। এতে আমাদের জীবনে সাফল্য আসবে, জন্মান্তরেও এই কুশল কর্মের ফলে উন্নত জীবন লাভ করা যাবে। কুশলকর্মের ফল শুধু নিজেই নয়, তার উত্তরাধিকারীগণ এবং সমাজ ও সকল প্রাণী ভোগ করে। পরাভব সূত্রের উপদেশগুলো মানুষের নৈতিক জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই, পরাভব সূত্রের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

পরাভব সূত্র কেন গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ : ৪

কলহ-বিবাদ সূত্র

মানুষ যে সকল অকুশল বা মন্দ কাজ করে তার মধ্যে কলহ-বিবাদ অন্যতম। কীভাবে কলহ-বিবাদ বর্জন করে ভালো কাজ করা যায় তা জানার জন্য কলহ-বিবাদের কারণ জানা আবশ্যক। সেজন্য ভগবান বুদ্ধ দেবতাদের অনুরোধে কলহ-বিবাদ সূত্রটি দেশনা করেন। এখানে সূত্রটি পালি ও বাংলায় বর্ণিত হলো।

কলহ-বিবাদ সূত্র (পালি ও বাংলা)

১। কুতোপহুতা কলহা বিবাদা, পরিদেবসোকা সহ মচ্ছরা চ;
মানাতিমানা সহপেসুণা চ, কুতোপহুতা তে তদিঙ্ঘ ব্রুহি।

বাংলা অনুবাদ : কোথা হতে কলহ, বিবাদ, পরিদেবন, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, পৈশুন্য ইত্যাদির সৃষ্টি হয়- তা দয়া করে প্রকাশ করুন।

২। পিযপ্পহুতো কলহা বিবাদা, পরিদেবসোকা সহমচ্ছর চ;
মানাতিমানা সহপেসুণা চ, মচ্ছেরযুত্তা কলহা বিবাদা,
বিবাদা জাতেসু চ পেসুণানি।

বাংলা অনুবাদ : প্রিয়বস্তু হতে কলহ, বিবাদ, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, পৈশুন্য ইত্যাদির সৃষ্টি হয়, কলহ ও বিবাদ মাৎসর্যের সাথে যুক্ত, বিবাদ থেকে পৈশুন্যের জন্ম হয়।

৩। পিযা সু লোকস্মিং কুতোনিদানা, যে চাপি লোভা বিচরন্তি লোকে;

আসা চ নিট্‌ঠা চ কুতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্‌স হোন্তি।

বাংলা অনুবাদ : জগতে কীভাবে প্রিয়বস্তু সমূহের উৎপত্তি হয়? জগতে বিদ্যমান লোভ, বাসনা ও পূর্ণতা, যা হতে মানুষের ভবিষ্যত জন্ম নির্ধারিত হয়, এসবের উৎপত্তি কীভাবে হয়?

৪। ছন্দানিদানানি পিযানি লোকে, যে চাপি লোভা বিচরন্তি লোকে;

আসা চ নিট্‌ঠা চ কুতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্‌স হোন্তি।

বাংলা অনুবাদ : জগতে ছন্দ (ইচ্ছা) নিদান (কারণ) হতে প্রিয় বস্তুসমূহের সৃষ্টি হয়। সংসারে যার সাহায্যে মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়, সেই লোভ, বাসনা ও পূর্ণতা - এ সবই ছন্দ (ইচ্ছা) হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৫। ছন্দো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো, বিনিচ্ছযা চাপিং কুতোপহুতা,

কোধো মোসবজ্জঞ্চ কথংকতা চ, যে বাপি ধম্মা সমণেন বুত্তা।

বাংলা অনুবাদ : জগতের ছন্দ (ইচ্ছা) কোন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়? বিনিশ্চয় কিরূপে উৎপন্ন হয়; ক্রোধ, মিথ্যাকথা, সন্দেহ এবং শ্রমণের সাহায্যে কথিত ধর্মসমূহের উৎপত্তি কোথা হতে হয়?

৬। সাতং অসাতন্তি যমাহু লোকে, তমূপনিস্‌সায় পহোতি ছন্দো;

রূপেসু দিস্বা বিভবং ভবঞ্চ, বিনিচ্ছযং কুব্বতি জন্তু লোকে।

বাংলা অনুবাদ : জগতে যা আনন্দ (সাত) এবং অপ্রীতিকরতা (অসাত) বলা হয়, তার মাধ্যমেই বাসনার উৎপত্তি হয়; সমস্ত রূপসমূহের ক্ষয় ও সৃষ্টি দর্শন করে মানুষ সংসারে সংকল্প করে থাকে।

৭। কোধো মোসবজ্জঞ্চ কথংকতা চ, এতেপি ধম্মা দ্বযমের সন্তে;

কথংকথী ঞাণপথায সিক্‌খে, ঞত্বা পবুত্তা সমণেন ধম্মা।

বাংলা অনুবাদ : ক্রোধ, মিথ্যাকথা এবং সন্দেহ – এরাও দু'প্রকার ধর্ম (আনন্দ ও অপ্রীতিকরতা) হতে উৎপন্ন হয়, সংশয়াভিভূত জ্ঞানমার্গে শিক্ষিত হবেন, জ্ঞান দ্বারাই শ্রমণ কর্তৃক ধর্মসমূহ ঘোষিত হয়েছে।

৮। সাতং অসাতঞ্চ কুতোনিদানা, স কস্মিং অসন্তে ন ভবন্তি হেতে;

বিভবং ভবঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং মে পব্রুহি যতোনিদানা।

বাংলা অনুবাদ : আনন্দ ও অপ্রীতিকরতার উৎপত্তির কারণ কোথায়, কোন বস্তুর অভাব হলে এদের উৎপত্তি হয় না? ধ্বংস ও সৃষ্টি রূপ সংস্কার কোন কারণ হতে উৎপন্ন হয়, প্রকাশ করুন।

৯। ফস্‌সনিদানং সাতং অসাতং, ফস্‌সে অসন্তে ন ভবন্তি হেতে;

বিভবং ভবঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং মে পব্রুহি কুতোনিদানং।

বাংলা অনুবাদ : স্পর্শের কারণ হতে আনন্দ ও অপ্রীতিকরতার সৃষ্টি হয়; স্পর্শের অভাব হলে তাদের সৃষ্টি হয় না; ধ্বংস ও সৃষ্টি রূপ সংস্কারও তা থেকেই উৎপন্ন হয় ।

১০ । ফস্সো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো, পরিগ্গহা চাপি কুতোপহুতা;

কিস্মিং অসন্তে ন মমত্তং নত্থি, কস্মিং বিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা ।

বাংলা অনুবাদ : জগতে স্পর্শের উৎপত্তি কোথায়, আসক্তি কী কারণে উৎপন্ন হয়, কোন বস্তুর অভাবে মমত্বের অস্তিত্ব নাই, কীসের নাশ হলে স্পর্শসমূহ স্পর্শে বিরত হয়?

১১ । নামঞ্চ রূপঞ্চ পটিচ্চ ফস্সো, ইচ্ছা নিদানানি পরিগ্গহানি;

ইচ্ছায সন্ত্য ন মমত্তং অত্থি, রূপে বিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা ।

বাংলা অনুবাদ : নাম রূপের কারণ হতে স্পর্শ সৃষ্টি হয়, ইচ্ছানিদানই আসক্তির উৎপত্তির কারণ; ইচ্ছা না থাকলে মমত্বের অস্তিত্ব থাকে না, রূপের নাশ হলে স্পর্শ সমূহ স্পর্শ করতে পারে না ।

১২ । কথং সমেতস্স বিভোতি রূপং, সুখং দুক্খঞ্চাপি কথং বিভোতি;

এতং মে পব্রুহি যথা বিভোতি তং জানিযামাতি মে মনো অহু ।

বাংলা অনুবাদ : কী রকম অবস্থায় রূপের নাশ হয়, সুখ ও দুঃখের ধ্বংস কীসে হয়? এর ক্ষয় কী রূপে হয় তা প্রকাশ করুন, আমরা জেনে নেব, এই আমার মনস্কাম ।

১৩ । ন সঞ্ঞসঞ্ঞী ন বিসঞ্ঞসঞ্ঞী, নোপি অসঞ্ঞী ন বিভূতসঞ্ঞী;

এবং সমেতস্স বিভোতি রূপং, সঞ্ঞানিদানা হি পপঞ্চসঙ্খা ।

বাংলা অনুবাদ : ইন্দ্রিয়সমূহ সংজ্ঞাযুক্ত হবে না, মিথ্যা সংজ্ঞাযুক্তও হবে না, সংজ্ঞাহীনও হবে না, সংজ্ঞা পরিত্যক্তও হবে না, এভাবে অবস্থান করলে রূপের নাশ হয়, প্রপঞ্চসমূহ সংজ্ঞার কারণেই উৎপন্ন হয়ে থাকে ।

১৪ । যং তং অপুচ্ছিম্হ তাকিত্তযী নো, অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রুহি;

এত্তাবতগ্গং নু বদন্তি হেলোকে যচিত্তমম সুদ্ধিং ইধ পন্ডিতাসে;

উদাহু অঞ্ঞম্পি বদন্তি এত্তো ।

বাংলা অনুবাদ : আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার উত্তর আপনি দিয়েছেন; আপনাকে এখন অন্য প্রশ্ন করব, তা প্রকাশ করুন; এই জগতে কোনো পন্ডিত চিত্ত শুদ্ধিকেই কি শ্রেষ্ঠ জিনিস বলেন না, অথবা তাঁরা কি অন্যরকম বলেন?

১৫। এত্তাবত'গ্গম্পি বদন্তি হেলোকে, চিত্তস্স সুদ্ধিং ইধ পন্ডিতাসে;

তেসং পনেকে সময়ং বদন্তি, অনুপাদিসেসে কুসলা বদানা।

বাংলা অনুবাদঃ কোন কোন পণ্ডিতলোক চিত্তশুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ জিনিস বলে থাকেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্ছেদ হয়ে যাওয়াকে শ্রেষ্ঠ মনে করে থাকেন, জ্ঞানীগণ স্কন্ধসমূহের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়াকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন।

১৬। এতে চ ঞত্ত্বা উপনিস্সিতাতি, ঞত্ত্বা মুনী নিস্সযে সো বিমংসী,

ঞত্ত্বা বিমুত্তো ন বিবাদ 'মেতি, ভবাভবায ন সমেতি ধীরোতি।

বাংলা অনুবাদঃ এঁদের 'আশ্রয়াধীন' জেনে, আশ্রয়সমূহ পরিজ্ঞাত হয়ে, বিমুক্ত হয়ে, অন্বেষণকারী মুনি বিবাদে নিযুক্ত হন না, জ্ঞানীলোক বার বার জন্মগ্রহণ করেন না।

পাঠ : ৫

কলহ-বিবাদ সূত্রের তাৎপর্য

কলহ-বিবাদ সূত্রে আমরা বুদ্ধের ধর্মের মূল দর্শন সম্পর্কে জানতে পারি। এই সূত্রে নিহিত আছে কলহের কারণ ও কলহ হতে মুক্তির উপায়। এই সূত্রটির যেমন আছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তেমন আছে জাগতিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা। প্রিয়বস্তু হতে কলহ, বিবাদ, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, পৈশুন্য ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। জগতে বিদ্যমান লোভ ও বাসনা থেকে প্রিয়বস্তু উৎপন্ন হয়। ইচ্ছা থেকেই লোভ বাসনা উৎপন্ন হয়। আনন্দ (সাত) এবং অপ্রীতিকরতা থেকে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। স্পর্শের কারণে আনন্দ ও অপ্রীতিকরতার সৃষ্টি হয়। নাম রূপের কারণে স্পর্শ সৃষ্টি হয়। ইচ্ছানিদানই আসক্তি উৎপত্তির কারণ। ইন্দ্রিয়সমূহ সংজ্ঞাযুক্ত হবে না, মিথ্যা সংজ্ঞাযুক্তও হবে না, সংজ্ঞাহীনও হবে না, সংজ্ঞা পরিত্যক্তও হবে না, এভাবে অবস্থান করলে রূপের নাশ হয়। রূপের নাশ হলে স্কন্ধসমূহের বিনাশ ঘটে। ফলে কলহ-বিবাদ উৎপন্ন হয় না।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বাসনা ক্ষয় করে নির্বাণের পথে এগিয়ে যান। ফলে জ্ঞানীরা নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। জন্ম নিরোধ হলে দুঃখের নিরোধ হয়। এই সূত্র আমাদের কলহের কারণ যেমন নির্দেশ করে তেমনিই কলহ হতে বিরত থাকার উপায়ও নির্দেশ করে। ফলে এ সূত্র অনুসরণ করে আমরা শান্তিপূর্ণ জীবনগঠনের শিক্ষা লাভ করতে পারি। তাই কলহ-বিবাদ সূত্রের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুশীলনীমূলক প্রশ্ন

প্রিয়বস্তু হতে কি কি উৎপন্ন হয় বল

ক্রোধ, মিথ্যাকথা এবং সন্দেহ কেন উৎপন্ন হয়?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কীসের দ্বারা মানুষের উপকার সাধন হয় ?

ক. সৎপথ
খ. সৎসঙ্গ
গ. সৎজীবিকা
ঘ. সৎজ্ঞান

২। অলস ব্যক্তির পরাজয় ঘটে –

i. কর্মের প্রতি অমনোযোগী হওয়ায়
ii. উদ্যমহীন হওয়ায়
iii. বেশি ঘুমানোর কারণে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

চন্দ্রমোহন জমিদারের দুই পুত্র। দুই পুত্রের মধ্যে স্বপন চাকমা প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যদের সাথে প্রতারণা করত। অপরদিকে অপরূপ চাকমা আদর্শবান ক্রিকেটার হিসেবে এলাকার উন্নয়নে এবং জ্ঞানী-গুণীজনের সেবায় এগিয়ে আসত।

৩। উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে ?

ক. পরাভব সূত্র
খ. কলহ-বিবাদ সূত্র
গ. মঙ্গলসূত্র
ঘ. করণীয় মৈত্রী সূত্র

৪। উক্ত সূত্রে স্বপন চাকমার আচরণে লজ্জিত হয়েছে –

i. নৈতিকতার
ii. উন্নত জীবনের
iii. সৎ কর্মের

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। **ঘটনা-১ :** টুটুল মার্মা পেশায় চাকরিজীবি। তিনি মা-বাবাকে ভরনপোষণ ও সেবা করেন। পাশাপাশি তিনি সাধ্যমতো শ্রমণ ও ভান্তেদেরকে দান দেন।

ঘটনা-২ : থুইক্যাচিং মার্মা পৈত্রিক সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। সে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প করে এবং মাদক সেবন ও জুয়া খেলে সম্পত্তির বিনাশ ঘটায়।

ক. কারা মঙ্গলসূত্র শুনে সন্তুষ্ট হয় ?

খ. কলহ-বিবাদ সূত্রের শিক্ষা কী ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ এ বর্ণিত বিষয়টি কোন সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ এ উক্ত সূত্রের আংশিক পরাজয়ের কারণ রয়েছে – তুমি কি এ বক্তব্যটির সাথে একমত ? যুক্তি দাও।

২। প্রতিবেশী সুমিতা চাকমার সাথে রমিতা দেওয়ানের প্রায়শই গৃহপালিত হাঁস-মুরগির ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়া হতো। ঝগড়ার সূত্র ধরে উভয়ের মিথ্যা এবং সন্দেহের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় এক ভিক্ষু এসে তাদের উদ্দেশ্যে কলহ-বিবাদ সূত্রের একটি গাথা শোনান।

ক. 'পরাভব সূত্রটি' খুদ্দক নিকায় এর কোন গ্রন্থের অন্তর্গত ?

খ. সূত্র ও নীতিগাথা বলতে কী বোঝায় ?

গ. রমিতা ও সুমিতার বিবাদের বিষয়টি কলহ বিবাদ সূত্রের কোন গাথার প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত গাথার মর্মার্থ দুই প্রতিবেশীর বিবাদ নিরসনে কী ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর। ব্যাখ্যা কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. পরাভব শব্দের অর্থ ..... ।

২. যে নিজে সুখে থেকে বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণ পোষণ করে না তার ..... হয়ে থাকে।

৩. সৎসঙ্গ ব্যক্তির প্রকৃত ..... সাধন করে।

৪. মাদক সেবীর ..... ঘটে।

৫. জ্ঞানী লোক বারবার ..... করেন না।

মিলকরণ

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

বাম	ডান
১. জন্ম নিরোধ হলে	স্কন্ধসমূহের বিনাশ ঘটে
২. রূপের নাশ হলে	দুঃখের নিরোধ হয়
৩. জ্ঞানী ব্যক্তিরা	পরাজিত মনে হয়
৪. নিজেকে অজ্ঞতাবশত	বাসনা ক্ষয় করে নির্বাণের পথে এগিয়ে যান
৫. নানা অকুশল কর্ম করার জন্য	মানুষের পতন বা ক্ষতি হয়ে থাকে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইত্থী সোস্তিং বিকিরনিং, পুরিসংবাপি তাদিনং,
ইসসরিস্মং ঠপেতি, তং পরাভবতো মুখং। - বাংলায় লেখ।

২. পরাভব সুত্র অনুযায়ী কুশল কর্মের ফল সংক্ষেপে লিখ।

৩. কলহ-বিবাদ সূত্রের শিক্ষা বর্ণনা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পরাভব সুত্র পাঠ করে কীভাবে নৈতিক জীবনযাপন করতে হয় আলোচনা কর।

২. কলহ-বিবাদ সূত্র অনুযায়ী জ্ঞানী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পারমী

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে বিভিন্ন সময়ে আমরা 'পারমী' শব্দটি পড়েছি। বৌদ্ধধর্মে পারমীর গুরত্ব অপরিসীম। কারণ বুদ্ধত্ব ও নির্বাণ লাভ করতে হলে পারমী অনুশীলন করে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্বরূপে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিটি জন্মে তিনি পারমী পূর্ণ করে জীবনের উৎকর্ষ সাধনপূর্বক বুদ্ধত্ব লাভের পথে অগ্রসর হন। এ অধ্যায়ে আমরা পারমী সম্পর্কে পড়ব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা -

* পারমীর পরিচয় ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
* দশ পারমী বর্ণনা করতে পারব।
* পারমীর তাৎপর্য মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

পারমী পরিচিতি

'পারমী' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো : পূর্ণতা, সমাপ্তি, সম্পূর্ণতা, প্রকৃষ্ট কৌশল, গুণ, সম্পূর্ণ গুণ বা জ্ঞান, উন্নত অবস্থা, সৎকার্যের পূর্ণতা সাধন, সামর্থ্য, পারমিতা ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে এরূপ বৈশিষ্ট্য বা গুণ অর্থে পারমী শব্দের প্রয়োগ হয়। উৎকর্ষ সাধন বা পরিশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য যে সাধনা বা সৎকর্মের অনুষ্ঠান তা-ই পারমী। বৌদ্ধধর্মে মানবতার পূর্ণ বিকাশ বা চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সাধন প্রণালী নির্দেশ করা হয়েছে তা পারমী নামে পরিচিত। এ সাধন প্রণালীর মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধত্ব লাভে অভিলাষী বোধিসত্ত্বগণকে পারমী পূর্ণ করতে হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, পারমী দশ প্রকার, যা দশ পারমিতা নামেও পরিচিত। যথা : আনুভূমিক বিন্যাস করতে হবে।

১) দান পারমী
২) শীল পারমী
৩) নৈষ্ক্রম্য পারমী
৪) প্রজ্ঞা পারমী
৫) বীর্য পারমী
৬) ক্ষান্তি পারমী
৭) সত্য পারমী
৮) অধিষ্ঠান পারমী
৯) মৈত্রী পারমী
১০) উপেক্ষা পারমী

পারমীসমূহ প্রত্যেকটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। যেমন: উপপারমী, পারমী এবং পরমার্থ পারমী। এভাবে পারমী ত্রিশ প্রকার। বোধিসত্ত্বগণ জন্মজন্মান্তরে এই ত্রিশ প্রকার পারমিতার পূর্ণতা সাধন করে শেষ জন্মে বোধি লাভ করে বুদ্ধ হয়ে থাকেন। জগত দুঃখে পরিপূর্ণ। দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করার একমাত্র পথ হলো নির্বাণ সাক্ষাত করা। নির্বাণ সাক্ষাত করতে হলে অর্হত্ব লাভ করতে হয়। অর্হত্ব প্রাপ্তির জন্য জন্মজন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করতে হয়।

নিচে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বকালীন জীবনের একটি কাহিনী তুলে ধরা হলো। এ কাহিনী থেকে আমরা পারমী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

দীপংকর বুদ্ধ ও সুমেধ তাপস

জগত জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মানুষ ও প্রাণিকুল জন্মগ্রহণ করে কর্মফল অনুযায়ী জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করে এবং পুনরায় কর্মফল অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। এভাবে তাকে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর আবর্তে ঘুরতে হয় অনন্তকাল। বুদ্ধগণ জগতের দুঃখময়তা অনুধাবন করে দুঃখ মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। সহজে বুদ্ধ হওয়া যায় না। এজন্য জন্মজন্মান্তরে কঠোর সাধনা ও বহু কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হয়। বুদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ ও সংকল্পবদ্ধ হতে হয়। গৌতম বুদ্ধ একজন্মে অমরাবতী নগরে জ্ঞানী তাপস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সুমেধ তাপস। ঐ সময় দীপংকর বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দীপংকর বুদ্ধ অমরাবতী নগরে আসবেন শুনে সেখানে তাঁকে বরণ করার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নগরকে নানাভাবে সজ্জিত করা হলো। সুমেধ তাপস জানতে পারলেন তথাগত বুদ্ধ আসছেন। তিনি বুদ্ধ দর্শনের দান

আনন্দে শিহরিত হলেন। কীভাবে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাবেন তা ভাবতে শুরু করলেন। বুদ্ধ আসছেন! যত নিকটবর্তী হচ্ছেন সুমেধ তাপস ততই পুলকিত হয়ে ভাবছেন তিনি কী করতে পারেন। তিনি লক্ষ করলেন বুদ্ধের আগমন পথের এক অংশ কর্দমাক্ত হয়ে আছে। তিনি ভাবলেন, বুদ্ধকে এই কাদায় পা রাখতে দেয়া যায় না। তিনি ঐ পথটুকুতে শুয়ে পড়লেন। বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর দেহের উপর দিয়ে হেঁটে যান। সুমেধ তাপসের এরূপ বুদ্ধভক্তি দেখে সমবেত জনগণ 'সাধুবাদ' প্রদান করল। বুদ্ধও বিমোহিত হলেন।

দীপংকর বুদ্ধের কাছে সুমেধ তাপস একটি প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন 'বুদ্ধ' হতে পারেন। দীপংকর বুদ্ধ আশীর্বাদ করে প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। সুমেধ তাপস ঐদিন থেকে ভবিষ্যতে বুদ্ধ হওয়ার জন্য পারমী পূর্ণ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। শুরু হয়ে গেল তাঁর পারমী পূরণের জন্য জন্মান্তর ব্যাপী কুশলকর্ম সম্পাদনের যাত্রা। পাঁচশত ঊনপঞ্চাশ বার বোধিসত্ত্ব রূপে জন্মগ্রহণ করার পর শেষ জন্মে কপিলাবস্তুর শাক্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তাঁকে পারমী পূর্ণ করতে হয়েছে। অবশেষে ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর সর্ব প্রাণীর কল্যাণের জন্য ধর্ম প্রচার করে কুশীনগরের যমক শালবৃক্ষের নিচে পরিনির্বাণ লাভ করলেন। পরিনির্বাণের মাধ্যমে তিনি জন্ম নিরোধ করলেন। এখানে সুমেধ তাপস বুদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শপথ গ্রহণপূর্বক জন্মজন্মান্তরে যে সকল কুশলকর্ম সম্পাদন করেছিলেন তা-ই পারমী। বোধিসত্ত্বগণ এভাবে পারমীসমূহ পূর্ণ করে থাকেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

পারমী শব্দের অর্থ কী?

পারমী বলতে কী বোঝ?

দশ পারমী কী কী?

পাঠ : ২

দশ পারমী

দান পারমী : দশ পারমীর মধ্যে দান পারমীর স্থান সর্বাগ্রে। গৌতম বুদ্ধ 'বুদ্ধত্ব' লাভের জন্য দশ পারমীর মধ্যে প্রথম 'দান পারমী'কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ দান মানুষের ত্রাণ বা রক্ষাকারী। দান দ্বারা মানুষের দুঃখ-দৈন্য দূর হয়। দান স্বর্গের সোপান সদৃশ এবং ইহকাল ও পরকালে শান্তিকর সুখ আনয়ন করে। তাই নিঃস্বার্থভাবে দান করে দান পারমী পূর্ণ করতে হয়। নিজের ধন সম্পত্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্ত্রী-পুত্র এবং জীবন উৎসর্গ করা দান পারমীর পর্যায়ভুক্ত। ত্যাগের পথ মহাপথ। গৌতম বুদ্ধ জন্মজন্মান্তরব্যাপী এ পথ অবলম্বন করে দান পারমী পূর্ণ করেছেন। তিনি দীপংকর বুদ্ধের সময় সুমেধ তাপসরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যয়ে দান পারমী পূরণের দৃঢ় সংকল্প করেন। তাই সংসার চক্রের দুঃখ হতে মুক্তি প্রত্যাশী ব্যক্তির দান পারমী পূরণ করা উচিত। দান পারমী তিন প্রকার। যথা : দান উপ-পারমী, দান পারমী, এবং দান পরমার্থ পারমী।

দান উপ-পারমী : অপরের জীবন রক্ষার্থে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন, চক্ষু, রক্ত, মাংস প্রভৃতি দান করাকে দান উপ-পারমী বলে। তথাগত বুদ্ধ শিবিরাজ জন্মে চক্ষু দান করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশেও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করে অনেকের জীবন রক্ষা করেছেন- এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

দান পারমী : ব্যবহারিক জীবনে উন্নত ও উদার চিত্তে অপরের সুখ-শান্তি কামনায় টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি বাহ্যিক বস্তু দান করাকে দান পারমী বলে। তথাগত বুদ্ধ বেস্সান্তর জন্মে ধন-সম্পদ, মঙ্গলহস্তি এবং পুত্র-কন্যাসহ স্ত্রীকেও দান করেছিলেন।

দান পরমার্থ পারমী : অপরের সুখ শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে পরমার্থ দান বলা হয়। সাধারণত বাহ্যিক বস্তু দান করা সহজ। জীবন দান করা খুবই কঠিন। জন্মজন্মান্তরে বাহ্যিক বস্তু দানের অভ্যাস না থাকলে জীবন উৎসর্গ করা যায় না। বাহ্যিক বস্তু দান অভ্যাস করার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জীবন উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়।

শীল পারমী : 'শীল' শব্দের অর্থ চরিত্র। তথাগত বুদ্ধ চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য যেসব নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন তা শীল নামে অভিহিত। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদনের চেতনাই শীল। শীল পারমীর পরিপূর্ণতায় মানব জীবন পরিশুদ্ধ হয়। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জীবন কলুষতাহীন এবং নির্বাণ অভিমুখী হয়। অপরদিকে দুঃশীল ব্যক্তির জীবন বেঁচে থেকেও মৃতবৎ। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দুঃশীল ব্যক্তি দ্বারা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রভূত অশান্তি সৃষ্টি হয়। এজন্য তথাগত বুদ্ধ শীলকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। গৌতম বুদ্ধ জন্মজন্মান্তরব্যাপী শীল পারমী চর্চা করেছেন। তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় একবার এক কুলপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা তাঁর মাতা এক জটিল রোগে আক্রান্ত হন। বহু চেষ্টা করেও রোগ নিরাময় করা গেল না। অবশেষে বৈদ্য পরামর্শ দিলেন যে, শশকের মাংস খাওয়ালে রোগ নিরাময় হবে। পরামর্শমতো কুলপুত্র বহু কষ্টে জীবিত এক শশক ধরলেন। তখন শশকটি প্রাণভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। শশকের আর্তনাদে কুলপুত্রের চিত্তে মৈত্রী উৎপন্ন হয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, আমার মায়ের জীবন আমার নিকট যেমন অতি প্রিয়, তেমনি এ অসহায় প্রাণীটির জীবনও তার কাছে অতি প্রিয়। একজনের জীবন রক্ষার জন্য অন্যের জীবন হরণ করব না - এরূপ ভেবে তিনি শশকটি ছেড়ে দিলেন। এভাবে বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতম অসংখ্য জন্মে শীল পারমী পূর্ণ করে চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করেছিলেন।

নৈষ্ক্রম্য পারমী : 'নৈষ্ক্রম্য' শব্দের অর্থ নির্গমন বা বের হয়ে যাওয়া। সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে বা সংসার হতে বের হয়ে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করাকে নৈষ্ক্রম্য বলা হয়। জাগতিক ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে সংসারের বন্ধন হতে মুক্তির জন্য উৎসাহী হওয়ার ব্রতকে নৈষ্ক্রম্য পারমী বলে। বুদ্ধবংস গ্রন্থে নৈষ্ক্রম্য পারমীর স্বরূপ সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা আছে : 'কারাগারে আবদ্ধ বন্ধনজনিত দুঃখে দুঃখিত ব্যক্তি যেমন তথায় চিরকাল বাস করলেও সেখানে থাকতে ইচ্ছা করে না, মুক্তি লাভের চেষ্টা করে; সেরূপ তুমিও ভবত্রয়কে কারাগারের ন্যায় ভেবে মুক্তির জন্য নৈষ্ক্রম্যাভিমুখী হও।' বুদ্ধ বলেছেন: গৃহবাস সবাধ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশ তুল্য। প্রব্রজিত ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন তা সহজেই পূর্ণ করতে পারেন। কারণ তিনি সংসারের জটিল বন্ধন থেকে মুক্ত। লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত। তিনি অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকেন ও উদ্যমশীল হন। বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজ্যা অবলম্বনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নৈষ্ক্রম্য পারমী পূরণের জন্য প্রথমে স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বাড়িঘর, সংসার

সম্পত্তি প্রভৃতি সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। বোধিসত্ত্বগণ অনাগারিক জীবনযাপন করে নৈষ্ক্রম্য পারমী পূর্ণ করেন এবং নির্বাণ লাভের সাধনার পথে অগ্রসর হন।

প্রজ্ঞা পারমী : 'প্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ হলো সম্যক চিন্তা। ভাবনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে প্রকৃষ্টরূপে জানা। জ্ঞান অর্জনের সাধনাই হলো প্রজ্ঞা পারমী। প্রজ্ঞা পারমী তিন প্রকার। যথা : চিন্তাময় প্রজ্ঞা, শ্রুতময় প্রজ্ঞা এবং ভাবনাময় প্রজ্ঞা। অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত পুনঃপুনঃ চিন্তা ভাবনার ফলে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকে চিন্তাময় প্রজ্ঞা বলে। সম্যকভাবে চিন্তা করলে সকল প্রকার কাজ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। এটিই চিন্তাময় প্রজ্ঞা। তথাগত বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে চিন্তাময় প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে। কারণ তিনি আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এ জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রুতিময় প্রজ্ঞা দুভাবে অর্জন করা যায়। জ্ঞানী-গুণী বা গুরুর নিকট শুনে এ জ্ঞান অর্জন করা যায়। আবার অন্যের সাহায্য ব্যতীত গবেষণার মাধ্যমেও এ জ্ঞান লাভ করা যায়। ধ্যান সমাধির দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে ভাবনাময় প্রজ্ঞা বলে। প্রজ্ঞা পারমীর অনুশীলনে ক্লেশসমূহ ধ্বংস হয়। অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি জাগ্রত হয়। বোধিসত্ত্বগণ প্রজ্ঞা পারমীর অনুশীলন করে অর্হত্ব ও বুদ্ধত্ব লাভের পথে অগ্রসর হন।

বীর্য পারমী : 'বীর্য' শব্দের অর্থ হলো বীরত্ব, কর্মশক্তি ইত্যাদি। প্রবল উৎসাহ ও সম্যক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কঠিন ব্রত সম্পাদন করাই হচ্ছে বীর্য পারমী। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য কঠোর সাধনা করেছিলেন। তিনি কঠিন সংকল্প করে বলেছিলেন, 'আমার শরীর অস্থি মজ্জা শুকিয়ে গেলেও আমি বুদ্ধত্ব লাভ না করে এ আসন থেকে উঠব না।' বুদ্ধত্ব লাভের এ প্রচেষ্টাই বীর্য পারমী। বোধিসত্ত্ব অতীত জন্মে এক কাঠবিড়ালীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কাঠবিড়ালীরূপী বোধিসত্ত্ব তখন নদীর ধারে এক বটবৃক্ষে বসবাস করত। সেখানে তার দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একদিন বাচ্চা দুটি নদীতে পড়ে সাগরে ভেসে যায়। এতে সে খুব কষ্ট পায় এবং লেজ দ্বারা সমুদ্র সেচন করে বাচ্চা দুটি উদ্ধার করার সংকল্প করে। অতঃপর সে লেজ দ্বারা সাগরের পানি সেচন করতে থাকে। তার এ কঠোর পরিশ্রম দেখে দেবরাজ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কাঠবিড়ালী তুমি কী করছ? কাঠবিড়ালী বলল, আমার বাচ্চা দুটি সাগরে তলিয়ে গেছে। তাদের উদ্ধারের জন্য জল সেচন করছি। ব্রাহ্মণ পুনরায় বলল, লেজ দ্বারা কি পানি সেচন করা সম্ভব? উত্তরে কাঠবিড়ালী বলল, চেষ্টা করলে সব কিছু করা যায়। অতঃপর সে প্রাণপণে লেজ দ্বারা সাগরের পানি সেচন করতে লাগল। কাঠবিড়ালীর উদ্যম ও চেষ্টা দেখে ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ, সমুদ্র হতে তার বাচ্চা দুটি উদ্ধার করে দিয়ে বললেন, 'কাঠবিড়ালী ! তোমার সদিচ্ছার জয় হোক।' বোধিসত্ত্বগণকে বীর্য পারমী সাধনা করতে হয়।

ক্ষান্তি পারমী : 'ক্ষান্তি' পারমী হচ্ছে সহনশীলতার সাধনা। ক্ষান্তি শব্দের অর্থ হলো : ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি, বিরতি ইত্যাদি। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। জ্ঞানীগণ সর্বদা ক্ষান্তি ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করে থাকেন। শাস্ত্রে ক্ষান্তি ও তিতিক্ষাকে পরম তপস্যা বলা হয়েছে। সর্ব অবস্থায় ক্ষমা বা সহণশীলতা প্রদর্শনের ব্রতই হচ্ছে ক্ষান্তি পারমী। বুদ্ধবংস গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'পৃথিবীতে শুচি অশুচি নানাবিধ বস্তু নিক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবী নীরবে সহ্য করে, নিক্ষেপকারীর প্রতি দয়া বা ক্রোধ কিছুই প্রদর্শন করে না। সেরূপ সকল মান-অপমান সহ্য করে ক্ষান্তি পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করতে হয়।' সবল হয়েও যিনি দুর্বলকে ক্ষমা করেন তাঁর ক্ষান্তিই পরম ক্ষান্তি। ক্ষান্তি পারমী চর্চাকারী ব্যক্তি লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোক ধর্মে অবিচল থাকেন। তাঁরা পৃথিবীর ন্যায় মৌন, ইন্দ্রখীলের ন্যায় স্থির এবং স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় নির্মল হন। ক্রোধ আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ক্রোধ শুধু নিজেকে দগ্ধ করে না, অপরকেও দগ্ধ করে।

ক্রোধকে একমাত্র ক্ষান্তি পারমীর অনুশীলন দ্বারা দমন করা যায়। বোধিসত্ত্বগণ সর্বদা ক্ষান্তি পারমী অনুশীলন করে সাধনার পথে নিজেকে এগিয়ে নেন।

সত্য পারমী : সর্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্রতকে সত্য পারমী বলে। বুদ্ধবংস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'সপ্তম পারমী অর্থাৎ সত্য পারমী ব্রত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে সত্যভাষি হলে সম্বোধি লাভের পথ সুগম হয়।' সত্য পারমীতে কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা প্রয়োজন। জাতকে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় গৌতম বুদ্ধের সত্য পারমী পূরণের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। এসব কাহিনীতে তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, মহাসুতসোম জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব নরমাংস খাদকের নিকট সত্যক্রিয়া করে মুক্তি লাভ করেন। একদা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বোধসত্ত্ব জীবন বিসর্জনের জন্য নরমাংস খাদকের নিকট উপস্থিত হন। নরমাংস খাদক তার সত্যব্রত দেখে বিস্মিত হয় এবং বোধিসত্ত্বের নিকট জীবনের মূল্যবান উপদেশ লাভ করে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সে বলির উদ্দেশ্যে আনা সকল পশুকে মুক্ত করে দেয় এবং নরমাংস গ্রহণ হতে বিরত থাকার শপথ নেয়। এ জাতকে বোধিসত্ত্বকে বলতে দেখি, 'নরমাংস খাদক আমাকে বধ করবে কিনা আমার কোনো সংশয় উৎপন্ন হয়নি। সত্য বাক্য রক্ষার জন্য আমি জীবনের মায়া ত্যাগ করে নরমাংস খাদকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। সত্যে আমার সমকক্ষ কেহ নেই। এরূপ ছিল আমার সত্য পারমী।' ত্রিপিটকে সত্য পারমী চর্চার এরূপ আরও অনেক কাহিনী পাওয়া যায়।

অধিষ্ঠান পারমী : 'অধিষ্ঠান' হলো দৃঢ় সংকল্পে অটল ও অচল থাকা। সর্ববিধ অন্তরায়কে পরাভূত করে কুশল কর্ম সম্পাদনে অবিচল থাকার ব্রতকে অধিষ্ঠান পারমী বলে। অধিষ্ঠান পারমীকে পারমীসমূহের মূলমন্ত্র বলা হয়। কারণ অধিষ্ঠান ছাড়া অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রধান অবলম্বন হলো অধিষ্ঠান। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সফলতার জন্য অধিষ্ঠান পারমীর অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধবংস গ্রন্থে বলা হয়েছে : অধিষ্ঠান পারমী গ্রহণ করলে সম্বোধি অর্জিত হয়। অচল, সুপ্রতিষ্ঠিত শিলাময় পর্বত যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝায় কম্পিত হয় না, স্বীয় স্থানে স্থিত থাকে, তদ্রূপ তুমিও অধিষ্ঠানে সর্বদা নিশ্চল হও। এরূপ অটল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তি সম্বোধি লাভে সমর্থ হন। ত্রিপিটকে বোধিসত্ত্ব জীবনে গৌতম বুদ্ধের অধিষ্ঠান পারমী পূরণের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। চরিয়পিটকে তেমিয় পণ্ডিত বোধিসত্ত্ব বলেন, 'মাতা-পিতা আমার অপ্রিয় ছিল না। আমার নিজের সত্ত্বা আমার কাছে অপ্রিয় নয়। কিন্তু সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জনই আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়তর। এজন্য আমি বিভিন্নভাবে অধিষ্ঠান রক্ষা করেছি, কখনো অধিষ্ঠান ভঙ্গ করিনি।'

মৈত্রী পারমী : স্নেহ, মায়া, মমতা, বন্ধুত্ব, প্রীতিভাব, ভালোবাসা ও উদারতা প্রদর্শন করাই হলো মৈত্রী। সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করার ব্রতই হচ্ছে মৈত্রী পারমী। মৈত্রী পারমীর চর্চায় পরিপূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হয়। মানব জীবনে সফলতা বা পরিপূর্ণতা আনয়ন করতে মৈত্রী পারমীর গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধবংস গ্রন্থে মৈত্রী পারমী সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে : জল যেমন সৎ-অসৎ, হীন-উত্তম, সকলকেই শীতলতার দ্বারা শান্ত করে এবং শরীরের ময়লা বিদূরিত করে, তেমনি শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমান প্রীতিভাব পোষণ করে মৈত্রী পারমীর সাধনা পূর্ণ করতে হয়।' যাঁরা মৈত্রী সাধনা করেন তাঁদের হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি দূর হয়। তাঁদের কায়-মন-বাক্য সংযত হয়। তাঁরা সর্বপ্রাণীর মঙ্গল কামনা করেন এবং সকলের প্রিয় হন। তাই মৈত্রী ভাবনাকারীর কোনো শত্রু থাকে না। তাঁদের ইহকাল ও পরকাল সুখের হয়। যিনি সকল জীবের প্রতি

মৈত্রীভাব পোষণ করেন, তিনি পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। এ কারণে বুদ্ধ সকলকে মৈত্রী পারমী অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিসীম মৈত্রীভাব পোষণ করবে।' ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আনয়নে মৈত্রী পারমীর অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন।

উপেক্ষা পারমী : 'উপেক্ষা' হলো সর্ববিষয়ে চিত্তের নিরপেক্ষ ও সাম্য অবস্থা। সাধারণত প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি দেখলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, অপ্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি দেখলে চিত্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। অনুরূপভাবে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে চিত্ত আনন্দিত ও দুঃখিত হয়। যথাযথ নিরীক্ষণের মাধ্যমে সর্ব বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে চিত্তের নিরপেক্ষভাব বজায় রাখার ব্রত হলো উপেক্ষা পারমী। উপেক্ষা পারমীর অনুশীলনে চিত্ত আসক্তিহীন বা বিরক্তিহীন, অনুকূলতা বা প্রতিকূলতাবিহীন থাকে। বুদ্ধবংস গ্রন্থে বর্ণিত আছে : তুলাদণ্ডের ন্যায় মধ্যস্থভাব সম্পন্ন হয়ে দৃঢ়চিত্তে উপেক্ষা পারমী অনুশীলন করতে হয়। গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় অনেকভাবে উপেক্ষা পারমী পূর্ণ করেছিলেন, মহালোমহংসক জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব একজন্মে ব্রহ্মচর্যা পালনে ইচ্ছুক হয়ে শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসময় তাঁর নাম হয় মহালোমহংসক ঋষি। সংসার অসার, এই দেহ ও জীবন ক্ষণস্থায়ী – এরূপ অনিত্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি সাংসারিক কাজকর্মে নির্লিপ্ত থাকতেন। এতে বহু লোক তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। ক্রমে লোমহংসক ঋষির লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি ও প্রশংসা আরও বেড়ে যায়। অপরদিকে কেউ কেউ তাঁকে ভণ্ড ঋষি বলে তিরস্কার করত। তিনি বলতেন, যে আমাকে দুঃখ দেয় কিংবা সুখ দেয় আমি উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন। এমনকি আমার প্রতি যার দয়া নেই তার প্রতিও আমার সমভাব রয়েছে। যারা আমাকে প্রশংসা বা নিন্দা করে তাঁদের সকলের প্রতি সর্বদা আমি সমভাবাপন্ন থাকি। এ আমার উপেক্ষা পারমী।

অনুশীলনমূলক কাজ

দান উপপারমী কাকে বলে?

নৈষ্ক্রম্য শব্দের অর্থ কী?

আট প্রকার লোকধর্ম কী?

পাঠ : ৩

পারমী সম্পর্কিত কাহিনী : মহাকপি জাতক

মহাকপি জাতকটি পাঠ করে আমরা দশ পারমী বোঝার চেষ্টা করব।

'কপি' শব্দের অর্থ বানর। একবার বোধিসত্ত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করে মহৎ কাজের জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন। এজন্যে এ জাতকটি মহাকপি জাতক নামে অভিহিত। বোধিসত্ত্ব মহাকপি এক বনে বাস করত। বনের পাশেই ছিল কাশী গ্রাম। ঐ গ্রামের এক কৃষক বনের মধ্যে তার গরু খুঁজতে এসে পথ হারিয়ে ফেলে। পথ খুঁজতে খুঁজতে সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ে। একটি ফলবান বৃক্ষ দেখে সে ঐ বৃক্ষে উঠে ফল খেতে গিয়ে বৃক্ষের নিচে গর্তে পড়ে যায়। গর্তটি খুব গভীর ছিল। কৃষক নিজের চেষ্টায় গর্ত থেকে ওপরে উঠতে

পারছিল না। এভাবে দশদিন অতিবাহিত হলো। কৃষক আরও দুর্বল হয়ে গেল। এক সময় বানররূপী বোধিসত্ত্ব ফল খাওয়ার জন্য ঐ বৃক্ষের কাছে এলে মৃতপ্রায় কৃষককে গর্তের মধ্যে দেখতে পেল। কৃষককে বিপদগ্রস্থ দেখে বানরের দয়া হলো। সে কৃষককে বাঁচানোর সংকল্প করল এবং বাঁচানোর উপায় খুঁজতে লাগল। নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও সে কৃষককে বাঁচানোর শপথ করল। অনেক চিন্তা করে সে বাঁচানোর উপায় বের করল। যদি কৃষককে পিঠে নিয়ে এক লাফে গর্ত থেকে উঠে আসা যায় তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব। এই ভেবে সে পিঠে বড় পাথর বেঁধে বার বার লাফ দেওয়া অনুশীলন করতে থাকল। এইকাজে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস অর্জনের পরে সে উদ্ধার অভিযান শুরু করলো। তার জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও সে তার সংকল্পে অটল রইল। বারবার চেষ্টার পর অবশেষে সে কৃষককে উদ্ধার করতে সক্ষম হলো।

কৃষককে গর্ত থেকে উদ্ধারের পরে বানর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই অচেতন কৃষকের কোলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে যায়। এসময় কৃষকের জ্ঞান ফিরলে সে বানরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। পাথর দিয়ে সে বানরের মাথায় আঘাত করে। এতে বানরের মাথা ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। তখন বানরটি এক লাফে গাছে উঠে যায়। এরপর বানর চিন্তা করল কীভাবে কৃষককে বন থেকে বার হতে সাহায্য করা যায়। বানর এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যেতে থাকে এবং রক্তের ফোঁটা নিচে পড়তে থাকে। এভাবে রক্তের ফোঁটা অনুসরণ করে কৃষক জঙ্গল থেকে বের হতে সমর্থ হয়।

ঐ কৃষককে বাঁচানোর জন্য বানরের কোনো স্বার্থ ছিল না। শুধু দয়া ও করুণার বশবর্তী হয়ে মহাকপি কৃষকের জীবন রক্ষা করেছিল। বোধিসত্ত্বগণ এরূপ আত্মত্যাগ করে পরের হিতের জন্য কুশলকর্ম করেন। এভাবেই পারমীসমূহ পূর্ণ করতে হয়।

এখন উপরে বর্ণিত মহাকপি জাতকে বানররূপী বোধিসত্ত্ব কীভাবে কোন পারমী পূর্ণ করেছেন তা চিহ্নিত করব।

১) (বানররূপী) বোধিসত্ত্ব নিজের জীবন বিপন্ন করে কৃষককে বাঁচাতে চেয়েছেন। আত্মত্যাগের এই ইচ্ছাই দান পারমীর অন্তর্গত।

২) কৃষক পাথর দিয়ে বানরের মাথায় আঘাত করা সত্ত্বেও তিনি কোনো হিংসা বা প্রতিহিংসা পোষণ করেননি। এটি শীল পারমী।

৩) কোনো কিছুর আকাঙ্খা করে তিনি কৃষকের জীবন রক্ষায় নিয়োজিত হননি। এটি নৈষ্ক্রম্য পারমী।

৪) কৃষককে গর্ত থেকে বাঁচানোর জন্য বোধিসত্ত্ব যে উপায় উদ্ভাবন করেন তা প্রজ্ঞা পারমী।

৫) কৃষককে উদ্ধারের জন্য বার বার লাফ দেওয়া অনুশীলন করে তিনি সাহসের সাথে কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বীর্য পারমীর উদাহরণ প্রদর্শন করেন।

৬) মাথায় আঘাত পেয়ে রক্তক্ষরণ ও প্রচণ্ড কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও কৃষকের প্রতি ক্ষুব্ধ আচরণ না করে চরম সহনশীলতা ও উদারতা প্রকাশ করেন। এই অহিংস চেতনাই ক্ষান্তি পারমী।

৭) সংকল্প রক্ষায় তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজের জীবন বিপন্ন অবস্থায়ও তিনি সংকল্পে অনড় ছিলেন। এটি সত্য পারমী।

৮) কৃষক বানরকে হত্যা করার চেষ্টা করলেও তিনি কৃষকের জীবন রক্ষার লক্ষ্য থেকে চ্যুত হননি। এই লক্ষ্যে একাগ্রতাই অধিষ্ঠান পারমী।

৯) গভীর গর্তে পতিত মরণাপন্ন কৃষককে দেখে বানর যে করুণা ও উদ্বিগ্নতার প্রকাশ করেন তা মৈত্রী পারমী।

১০) বানর কৃষকের হত্যা প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব না দিয়ে ধৈর্য ও করণীয় কর্মে একাগ্রতা বজায় রেখে যান এবং কৃষককে বনের বাইরে যেতে সাহায্য করেন। এই মনোভাব দ্বারা তিনি উপেক্ষা পারমীর দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে বোধিসত্ত্বের পারমী পূরণের এরূপ আরও অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। কাহিনীগুলো পাঠ করলে পারমী পূরণের উৎসাহ জাগ্রত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বানররূপী বোধিসত্ত্ব কীভাবে দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন?

মহাকপি জাতকে বোধিসত্ত্ব কি কি পারমী পূর্ণ করেছিলেন?

পাঠ : ৪

বৌদ্ধধর্মে দশ পারমী চর্চার গুরুত্ব

নির্বাণ বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য। পারমীর চর্চা ব্যতীত নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। তাই বৌদ্ধধর্মে পারমী গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত এবং বৌদ্ধদের জন্য পারমী অনুশীলন করা অপরিহার্য। দশপারমী পূরণের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বোধিসত্ত্বগণও বুদ্ধত্ব লাভের জন্য পারমী চর্চা করেন। কুশল কর্ম করার মাধ্যমে পারমী চর্চা করতে হয়। দশ পারমী চর্চায় চরিত্রের উৎকর্ষ ও পরিশুদ্ধিতা অর্জিত হয়। মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধিত হয়। ভয়– ভীতি, লোভ–দ্বেষ–মোহ, অজ্ঞতা, শত্রুতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়। আর্তপীড়িতের সেবা এবং পরোপকার করার প্রেরণা জাগায়। দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, কর্মোদ্যম প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। পারমীর অনুশীলনে ছাত্র জীবনেও সাফল্য লাভ করা যায়। তাই ছাত্র জীবনে পারমীর অনুশীলন করা একান্ত দরকার। পরিবার ও সমাজে বিরাজমান বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি স্থাপনে পারমী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারমীর গুণসমূহ শুধু বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের জন্য নয় এগুলো সকল বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আচরণীয় হতে পারে। দশপারমীর চর্চা জীবনে সাফল্য ও পূর্ণতা আনয়ন করে। পরিশেষে বলা যায়, নৈতিক, মানবিক ও উন্নত জীবন গঠনে দশপারমী চর্চা অত্যাবশ্যক।

অনুশীলনমূলক কাজ

ছাত্র হিসাবে তুমি কোন কোন পারমী অনুশীলন করতে পার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দান পারমী কয় প্রকার ?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

২। বৌদ্ধধর্মে পারমীর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এতে –

i. জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়

ii. নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হয়

iii. বুদ্ধত্ব লাভের হেতু উৎপন্ন হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

উচিংজ্য রাখাইন পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় নানাবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করে ইহজন্মে উচ্চ বংশে জন্মলাভ করেন। তিনি জীবনের আশা–আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে প্রব্রজ্যাধারী হয়ে ধ্যান–সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এতে পরজন্মে তাঁর বোধিজ্ঞান অর্জন হবে বলে ধারণা জন্মে।

৩। উচিংজ্য রাখাইন কী পূরণের লক্ষ্যে প্রব্রজ্যা লাভ করেন ?

ক. সুখ খ. স্বর্গ

গ. পারমী ঘ. জ্ঞান

৪। পরজন্মে বোধিজ্ঞান অর্জিত হবে উচিংজ্য রাখাইনের এই ধারণায় প্রকাশ পেয়েছে –

i. পারমী পূরণের সংকল্প

ii. কুশল কর্ম সম্পাদন

iii. কঠোর তপস্যা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কুনেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা নিজ বাড়িতে এক অর্হৎ ভিক্ষুকে মঙ্গালসূত্র শ্রবণের উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বাড়ির অনতিদূরে খালের ওপর ব্রিজের একাংশ বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। যার কারণে ঐ ভিক্ষুর আগমন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কুনেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা সুকৌশলে ভিক্ষুকে ঐদিন পারাপারের যথাযথ ব্যবস্থা করে বাড়িতে আনেন। ভবিষ্যতে তিনি যাতে ভিক্ষু হতে পারেন এজন্য অর্হৎ ভিক্ষুর নিকট প্রার্থনা করেন।

ক. বুদ্ধত্বলাভে অভিলাষী বোধিসত্ত্বগণকে কী পূর্ণ করতে হয় ?

খ. মৈত্রী পারমী বলতে কী বোঝায় ?

গ. কুনেন্দু তঞ্চঙ্গ্যার কর্মকান্ডের সাথে পারমী পাঠের কোন্ ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কর্মকান্ডের দ্বারা কুনেন্দু তঞ্চঙ্গ্যা যে পারমী পূরণে সমর্থ হবেন – তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে লেখ।

২। মুনীন্দ্র চাকমা ও যতীন্দ্র চাকমা দুজনেই সহপাঠী ছিলেন। যতীন্দ্র চাকমা অত্যন্ত কুটিল প্রকৃতির ছিল বিধায় মুনীন্দ্রের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল না। একদা মুনীন্দ্র চাকরির সুবাদে নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার সময় রাস্তায় ডাকাত দলের আক্রমণে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে বন্দি অবস্থায় দিনযাপন করতে থাকেন। যতীন্দ্র চাকমাও একদিন অনুরূপ ঘটনায় পতিত হন। ডাকাতেরা দু'জনকে একত্রে বন্দি করে রাখে। মুনীন্দ্রের আহত অবস্থা দেখে যতীন্দ্র অবাক হন। অতঃপর দুজনে মিলে কৌশলে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তারা ডাকাতদের প্রতি হিংসা না করে ক্ষমা করে দেন।

ক. থেরবাদ বৌদ্ধমতে, পারমী কয় প্রকার ?

খ. সত্য পারমী বলতে কী বোঝায় ?

গ. মুনীন্দ্র ও যতীন্দ্র চাকমার ঘটনায় বোধিসত্ত্বের পারমী পূরণের যে বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত ঘটনায় উভয়ের আচরণিক পরিবর্তনে দশপারমীর গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ‘পারমী’ শব্দের অর্থ.....।

২. গৌতমবুদ্ধ এক জন্মে .....নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. বোধিসত্ত্ব জন্মজন্মান্তরে ..... সমূহ পূর্ণ করেন।

৪. পারমীসমূহ প্রত্যেকটি ..... প্রকার

৫. আমরা .....করার প্রত্যয় নিয়ে পারমী চর্চা করতে পারি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পারমী বলতে কী বোঝ ব্যাখ্যা কর?

২. সুমেধ তাপস কী করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দান পারমী বর্ণনা কর।

২. ‘মহাকপি’ জাতকের কাহিনী বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসব

প্রত্যেক ধর্মেই কিছু আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসব থাকে। বৌদ্ধধর্মেও আছে। আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে বৌদ্ধধর্মীয় কিছু আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে জেনেছি। এসব আচার–অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কেও অনেক কিছু শেখা যায়। প্রত্যেকটি ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব জানার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করা উচিত। এছাড়া ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে কঠিন ধর্মীয় তত্ত্ব বুঝতে সহজ হয়। ধর্মীয় কঠোর নিয়ম–নীতি মেনে চলতে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। তাই এসব আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসবের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা কতিপয় বৌদ্ধধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ।
- শ্রামণ্য জীবনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- সুফলসহ সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসবের গুরুত্ব

আচার–অনুষ্ঠান ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গৌতমবুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে আচার–অনুষ্ঠানের কোনো বিধি প্রবর্তন করেননি। তিনি বলেছিলেন অন্তরের মধ্যে আলোক উৎপাদনই হলো ধর্মের মূল লক্ষ্য। এই আলোক হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। এই আলো প্রজ্জ্বলনের সাধনা অত্যন্ত কঠিন। শান্ত ও স্থির চিত্তে গভীর একাগ্রতার মাধ্যমে এ সাধনা করতে হয়। কিন্তু আমাদের মন বা চিত্ত বড়ই চঞ্চল। এটিকে বশে আনার জন্য কোনো একটি অবলম্বন দরকার। এখানে অবলম্বন হলো চিন্তাশীল কোনো কাজ, যার মাধ্যমে মন বা চিত্তকে স্থির রাখা যায়। ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ মনকে স্থির রাখার অবলম্বন হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ধর্ম ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে। এজন্য তথাগত বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আচার–অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের উপদেশ প্রদান করেন।

ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য চিত্তের বিকাশ সাধন ও পুণ্য অর্জন। এগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত গুরুত্বও রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে সকলে এক স্থানে মিলিত হয়। এতে পরস্পরের ভাব বিনিময় হয়। সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় হয়।

গৌতমবুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের উপদেশ দিয়েছেন। এতে তিনি সাতটি অনুশীলনীয় নীতির কথা বলেছেন, যা 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' নামে পরিচিত। এ নীতিগুলো পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সহায়ক। এ প্রসঙ্গে দুটি নীতি উল্লেখ করা হলো : ১। সভা সমিতির মাধ্যমে যারা সব সময় একত্র হয় তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় ; ২। যারা একতাবদ্ধভাবে সভা–সমিতিতে সম্মিলিত হয়, সভা শেষ হলে এক সঙ্গে চলে যায় এবং কোনো কিছু করার কারণ ঘটলে সম্মিলিতভাবে করে, তাদের উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় না। সুতরাং সমাজের সকলের সাথে মাঝে মাঝে মিলিত হওয়া, মত বিনিময় করা অত্যাবশ্যক। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ সম্মিলিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সঙ্ঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবার–পরিজন, আত্মীয়–স্বজন ও সমাজের নানা শ্রেণির মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত ও ভাব বিনিময় হয়। অনুষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করার মধ্যেও আনন্দ আছে।

পুজোপকরণ নিয়ে বিহারে যাচ্ছেন

এছাড়া পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমনঃ থের গাথার রাষ্ট্রপাল স্থবিরের জীবনীতে দেখা যায় তিনি গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী ফুস্‌স বুদ্ধের সময় একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি রাজকর্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। একদিন রাজপুত্ররা বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান দিতে দেখে তিনিও শ্রদ্ধা চিত্তে দানকর্মে সহায়তা করেন। এ সময় তিনি ভবিষ্যত জীবনে বুদ্ধ শিষ্য হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। দানকার্যে শ্রদ্ধা চিত্তে সহায়তার কারণে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধের শিষ্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অসীম পুণ্য অর্জিত হয়েছে এরূপ অসংখ্য কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমাদের সকল প্রকার ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধদের কয়েকটি ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসবের নাম বল

পাঠ : ২

প্রব্রজ্যা

পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে বৌদ্ধ রীতিতে সন্ন্যাস অবলম্বনের নাম প্রব্রজ্যা। প্রব্রজ্যা বৌদ্ধ সন্ন্যাস জীবনের প্রথম পর্যায়। এটিকে শ্রমণ হওয়া বা শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হওয়াও বলে। এটি বৌদ্ধদের পুণ্যময় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান; সংসার ত্যাগের মাধ্যমে মুক্তির পথ অনুসন্ধানের প্রথম পদক্ষেপ। বৌদ্ধ মাত্রই জীবনে একবার হলেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে থাকে। পরম শান্তিময় নির্বাণে উপনীত হওয়াই প্রব্রজ্যা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রব্রজ্যার অর্থ হলো সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার অঙ্গীকার। পালি ভাষায় বলা হয় – পাপকানং মলং পব্বাজেতী'তি পব্বজিতো। অর্থাৎ নিজের পাপমল বর্জনে সংকল্পবদ্ধ হন বলেই তাঁকে প্রব্রজিত বলা হয়।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ গৃহীদের সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল কাজ। বুদ্ধের মতে, গর্তে পতিত হলে মানুষের মুক্তি যেমন কষ্টকর, সেরূপ সংসারে আবদ্ধ হলে সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও দুষ্কর। মানুষ সহজে লোভ–দ্বেষ–মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে না। সেজন্য বুদ্ধ সংসারকে কারাগার এবং প্রব্রজ্যাকে উন্মুক্ত আকাশের সাথে তুলনা করেছেন। তাই অনেকে ধন–সম্পদ, পরিবার–পরিজন এবং ভোগ–ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে নির্বাণের সন্ধানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেজন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহের জন্য হলেও সন্তানদের প্রব্রজ্যা দেওয়া প্রত্যেক মাতাপিতার কর্তব্য। প্রব্রজ্যা প্রদানের মাধ্যমে মাতাপিতা সন্তানকে ধর্মীয় নীতি–আদর্শ শেখার এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার সুযোগ করে দেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিয়ম

প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে প্রথমে মাতা–পিতার অনুমতি নিতে হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণের দিন মস্তক মুন্ডন করতে হয়। তারপর ভিক্ষু শ্রমণদের ব্যবহার্য অষ্টপরিষ্কার নিয়ে বিহারে উপস্থিত হতে হয়। অষ্টপরিষ্কার বা আটটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলো : ১। সঙ্ঘাটি, যাকে দোয়াজিকও বলা হয়। এ চীবরটি ভাঁজ করে কাঁধে রাখা হয়; ২। উত্তরাসঙ্গ, যাকে একাজিক বা বর্হিবাস বলা হয়। এ চীবরটি দ্বারা শরীরের ঊর্ধ্বাংশ আবৃত করা হয়; ৩। অন্তর্বাস – এ চীবর শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য পরিধান করা হয়; ৪। ভিক্ষাপাত্র; ৫। ক্ষুর; ৬। সূঁচ–সূতা; ৭। কটিবন্ধনী (কোমরবন্ধনী) এবং ৮। জলছাঁকনি। এগুলোসহ বিহারাধ্যক্ষের কাছে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করতে হয়। অষ্টপরিষ্কারসমূহ সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে হয়। চীবর তিনটি ক্রমান্বয়ে গোলাকার করে মুড়িয়ে মন্দিরের চূড়ার মতো করে সাজাতে হয়। চীবরের চূড়াটি কটিবন্ধনী দিয়ে বাঁধতে হয়। তারপর ভিক্ষাপাত্রে রাখা হয়। অন্যান্য দ্রব্যগুলোও ভিক্ষাপাত্রে রাখা হয়।

চীবরসহ ভিক্ষাপাত্র

সাত বছরের কম বয়সের ছেলেকে প্রব্রজ্যা দেওয়ার বিধান নেই। কারণ এ বয়সে মানুষের উপলব্ধিবোধ পরিপক্ক হয় না। আবার যে ভিক্ষু কমপক্ষে দশ বছর ভিক্ষুজীবন পূর্ণ করেননি তিনি প্রব্রজ্যা প্রদান করতে পারেন না। সুতরাং প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে আগেই আচার্য ঠিক করে নিতে হয়। আচার্যকে গুরুও বলা হয়। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁর পরামর্শে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। তাঁকে বলা হয় উপাধ্যায়। উপাধ্যায় প্রব্রজিতকে নতুন নাম প্রদান করেন। প্রব্রজিত ব্যক্তি প্রব্রজ্যার পর হতে নতুন নামেই পরিচিত হন।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থীকে প্রথমে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধভাবে এবং স্পষ্টরূপে ত্রিশরণ উচ্চারণ করতে হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত গৃহীরাও সমবেতভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, প্রব্রজ্যা দাতা এবং প্রব্রজ্যাপ্রার্থী উভয়ের উচ্চারণ স্পষ্ট ও শুদ্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়। পঞ্চশীল গ্রহণ করার পর প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ভিক্ষুদের কাছে প্রব্রজ্যা শীল প্রার্থনা করেন। প্রবজ্যাশীলকে দশশীলও বলা হয়।

প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

প্রব্রজ্যা প্রার্থনার সময় প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে বিশেষ নিয়মে বসতে হয়। গোলাকার চীবরের চূড়াটি দুই হাতে ধরে কপালে লাগাতে হয়। তারপর পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে দুই হাঁটু জোড় করে বসতে হয়। নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি গভীরভাবে অর্থ উপলব্ধি করে বলতে হয় :

ওকাস অহং ভন্তে পব্বজ্জং যাচামি।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে পব্বজ্জং যাচামি।

ততিযম্পি অহং ভন্তে পব্বজ্জং যাচামি।

বাংলা অনুবাদ : ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়বারও ভন্তে, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি।

তৃতীয়বারও ভন্তে, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি।

এরপর প্রব্রজ্যা প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও কারণ হিসেবে নিচের প্রার্থনাটি করতে হয়।

সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

দুতিযম্পি সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

ততিযম্পি সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

বাংলা অনুবাদ : ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তারপর প্রব্যজ্যা প্রার্থীকে দীক্ষাদানকারী আচার্যের হাতে চীবরসমূহ তুলে দিতে হয়। অতঃপর হাতজোড় করে নিচের প্রার্থনাটি করতে হয় :

সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

দুতিযম্পি সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

ততিযম্পি সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

বাংলা অনুবাদ : ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) দিয়ে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) দিয়ে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসমূহ) দিয়ে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

অতঃপর, উপাধ্যায় শরীরের বত্রিশ প্রকার অশুভ বিষয় হতে প্রথম পাঁচটিকে নিয়ে কর্মস্থান ভাবনা দেন। এগুলো হলো – কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। এটি অনুলোম প্রতিলোমাকারে উচ্চারণ করতে হয়। তারপর চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার মাধ্যমে চীবর গ্রহণ করতে হয়। ভাবনাটি এরূপ :

পটিসঙ্খা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায় উণ্হস্স পটিঘাতায়, ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সম্ফস্সানং পটিঘাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনত্থং।

বাংলা অনুবাদ : সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করতে আমি এ চীবর পরিধান করছি। এ চীবর শুধু শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, দংশক-মশক-ধুলাবায়ু-রৌদ্র-সরীসৃপ ও বৃশ্চিকাদির আক্রমণ ও দংশন নিবারণ এবং লজ্জা নিবারণের জন্যে।

এ ভাবনা গ্রহণের পর গৃহী পোশাক পরিত্যাগ করে চীবর পরিধান করা হয়। চীবর পরিধান করে ভিক্ষুসঙ্ঘের সামনে এসে প্রব্রজ্যা শীল বা দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। এ সময় উপাধ্যায় বা আচার্য দশশীল প্রদান করেন। দশশীল গ্রহণের পর প্রব্রজ্যা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। দশশীল হলো প্রব্রজিতদের নিত্য পালনীয় দশটি নিয়ম। এরপর প্রব্রজিত শ্রমণকে নতুন নাম প্রদান করা হয়। প্রব্রজিত ব্যক্তি যতদিন দীক্ষিত অবস্থায় থাকেন ততদিন এ নামে পরিচিত হন।

প্রব্রজ্যা দান সম্পন্ন হলে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাগণ প্রব্রজিতকে অভিবাদন জানিয়ে নানা দ্রব্য সামগ্রী দান করেন।

প্রব্রজ্যা কার্যক্রমের প্রত্যেকটি পর্যায় ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করতে হয়, যাতে প্রব্রজ্যা প্রার্থীর কাছে প্রতিটি ধাপের পরিবর্তন সহজে বোধগম্য হয়। এভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থী তাঁর জীবনের পরিবর্তন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কত বছরের কম বয়সের ছেলেকে প্রব্রজ্যা প্রদান করা যায় না?

প্রত্যবেক্ষণ ভাবনাটির বাংলা অনুবাদ বল।

দশশীল কাদের নিত্যপালনীয় শীল?

পাঠ : ৩

প্রব্রজ্যার সুফল

প্রব্রজ্যা এক প্রকার বিশুদ্ধ জীবনচর্চা ব্রত। এটিকে মুক্ত জীবনও বলা যায়। এরূপ ব্রত গ্রহণের জন্য প্রথমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হয়। কারণ এ জীবন সাধারণ জীবনধারা থেকে ব্যতিক্রম। নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হয় দৈনন্দিন জীবন। প্রব্রজিতদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো শারীরিক ও মানসিকভাবে পালন করতে হয়। তাঁদের নৈতিক জীবনযাপন ও সর্বদা কুশল কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকতে হয়। সকল প্রকার পাপকর্ম হতে বিরত থাকতে হয়। নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যমী হতে হয়। ফলে প্রব্রজিতের জীবন পঙ্কিলতামুক্ত থাকে। তিনি নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান থাকে। নির্মল আনন্দের অধিকারী হন। এসব গুণের জন্য সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। এছাড়াও প্রব্রজ্যার অনেক সুফল রয়েছে।

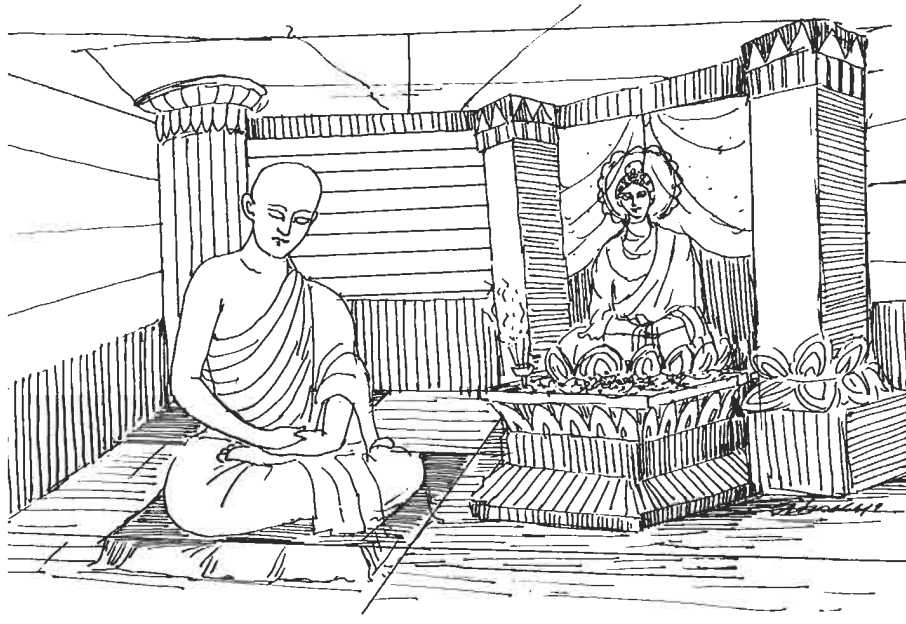

ধ্যানরত একজন তরুণ শ্রমণ

নিচে প্রব্রজ্যার কতিপয় সুফল বর্ণিত হলো :

১। কায়, বাক্য ও মনোদ্বার সংযত হয়।
২। রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রশমিত হয়।
৩। অকুশল কর্মচেতনা বিনাশ হয়।
৪। কুশলকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হন।
৫। অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকেন।
৬। জ্ঞান সাধনায় প্রত্যয়ী হন।
৭। ভিক্ষুজীবন গ্রহণে আগ্রহী হন।
৮। দুর্গতির পথ বন্ধ হয় এবং সুগতি প্রাপ্ত হন।
৯। বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব জানা ও চর্চার সুযোগ হয়।
১০। বিপুল পুণ্য সম্পদের অধিকারী হন।
১১। জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং আসক্তিমুক্ত হয়।
১২। নির্বাণ পথের অনুগামী হন।

এছাড়া প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে অন্যদেরও ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক চেতনাও বিকশিত হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বাহ্নে আনন্দ শোভাযাত্রা হয়। এসময় ভক্তিমূলক গান, বুদ্ধকীর্তন ও জয়ধ্বনি করা হয়। সকল বয়সের নারী-পুরুষ শ্রদ্ধাচিত্তে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে অভিনন্দিত করা হয়। আবার যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, প্রব্রজ্যা ত্যাগের পর তাঁদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। এটি হলো কিছুদিন বিশুদ্ধ জীবনাচার অনুশীলনের সম্মাননা বা কৃতজ্ঞতা। সুশৃঙখল জীবন গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক বৌদ্ধের জীবনে কিছুদিন হলেও এই প্রব্রজ্যাব্রত গ্রহণ করা উচিত। এই ব্রত গ্রহণ ছাড়া প্রব্রজ্যা জীবনের বিশুদ্ধতা, আদর্শ ও উৎকর্ষ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সন্তানকে প্রব্রজ্যা দান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি চুরাশি হাজার ধাতুচৈত্য ও চুরাশি হাজার বিহার মহা উৎসবের সঙ্গে দান করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - 'মাননীয় সঙ্ঘ ! বুদ্ধ শাসনে শ্রেষ্ঠ দাতা কে? কার দান অধিক?' উত্তরে ভিক্ষুসঙ্ঘ বলেন, 'মহারাজ ! আপনিই শ্রেষ্ঠ দাতা। আপনার মতো দান আর কেহ করেনি। আপনার দান সর্বাপেক্ষা অধিক।' একথা শুনে সম্রাট অশোক খুবই প্রীতি অনুভব করেন। আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হয়ে তিনি পুনরায় ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভন্তে ! আমি বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি কি?' তখন ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মতি ক্রমে মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য স্থবির বলেন, 'মহারাজ ! আপনি ভিক্ষুসঙ্ঘের ভরণ-পোষণের দাতা মাত্র। কেহ যদি ব্রহ্মলোক প্রমাণ স্তূপ করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বিবিধ দানীয়বস্তু দান করে, তিনি উদার দায়ক হন মাত্র, বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যিনি স্বীয় পুত্রকে প্রব্রজিত করে বুদ্ধশাসনে দান' করেন তিনিই কেবল বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হন।' একথা শুনে সম্রাট অশোক উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমি এত দান করার পরও বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারলাম না। অতঃপর, তিনি পুত্র-কন্যার সম্মতি নিয়ে তাঁদেরকে প্রব্রজিত করে সঙ্ঘে দান করেন এবং বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হন। প্রব্রজ্যার সুফল সম্পর্কে আরো বলা হয়ে থাকে যে, জম্বুদ্বীপের সর্বত্র বিহার নির্মাণ করিয়ে দান করলে যে ফল লাভ হয়, তা বুদ্ধশাসনে সন্তানকে প্রব্রজিত করে দান করলে সে ফলের ষোল ভাগের একভাগও হয় না। উল্লেখ্য ভারতীয় উপমহাদেশ সে সময় জাম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রব্রজ্যার পাঁচটি সুফল লেখ।

কী করলে বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়?

পাঠ : ৪

উপসম্পদা

শ্রমণ থেকে ভিক্ষু হওয়ার যে অনুষ্ঠান তার নাম উপসম্পদা। উপসম্পদা হচ্ছে উচ্চতর নিয়ম-নীতি সম্পাদনের ব্রত। প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় সমাপ্তির পর উপসম্পদা দিতে হয়। মানসিকভাবে অসুস্থ, ঋণগ্রস্থ, রাষ্ট্রীয় দণ্ডপ্রাপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তি উপসম্পদার যোগ্য নয়।

সরাসরি উপসম্পদা প্রদান করা হয় না। আগে প্রব্রজিত হয়ে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। উপসম্পদার জন্য কমপক্ষে বিশ (কুড়ি) বছর বয়স হতে হয়। উপসম্পদা প্রার্থীকে মাতাপিতার অনুমতি নিতে হয়। অতঃপর ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অষ্টপরিষ্কার নিয়ে কোনো ভিক্ষুর শরণাপন্ন হতে হয়। সেই ভিক্ষুই সাধারণত তাঁর উপাধ্যায় বা গুরু হন। ভিক্ষুদের উপোসথের স্থান ভিক্ষুসীমায় বসে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন করতে হয়। কোনো বিহারে ভিক্ষুসীমা না থাকলে, যে নদী বা খালে জোয়ার ভাটা হয় সেখানেও উপসম্পদা দেয়া যায়। এখানে নৌকায় বসে করণীয় সম্পন্ন করতে হয়। এর নাম 'উদকসীমা উপসম্পদা'।

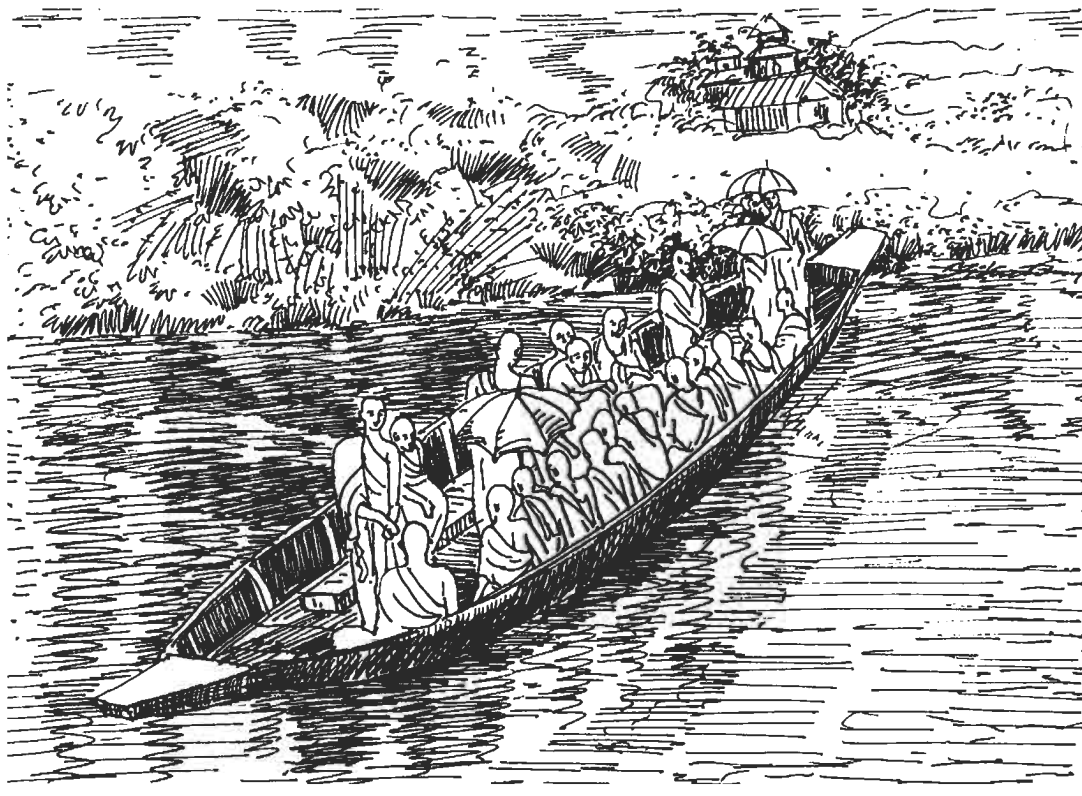

উদকসীমায় উপসম্পদা প্রদান অনুষ্ঠান

উপসম্পদার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। প্রথমে প্রার্থীকে উপরে বর্ণিত দোষসমূহ আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হয়। তারপর অভিভাবকের মতামতের কথা জেনে উপসম্পদার অনুমতি প্রদান করা হয়। উপসম্পদা প্রার্থীকে উপসম্পদা প্রদান স্থানে বসে উপস্থিত ভিক্ষুদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনাটি নিম্নরূপ :

সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো- অনুকম্পং উপাদায।

দুতিযম্পি সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো- অনুকম্পং উপাদায।

ততিযম্পি সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো- অনুকম্পং উপাদায।

বাংলা অনুবাদ :

মাননীয় সঙ্ঘ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

দ্বিতীয়বার সঙ্ঘ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

তৃতীয়বার সঙ্ঘ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

এরপর উপস্থিত সঙ্ঘ সকলের সম্মতি সাপেক্ষে 'কর্মবাচা' পাঠ করে প্রার্থীকে উপসম্পদা প্রদান করেন। কর্মবাচা হলো ভিক্ষুর কর্মনীতির একটি অংশ। এর মাধ্যমে উপসম্পদা লাভকারী ভিক্ষু হিসেবে পরিচিত হন এবং সঙ্ঘের সদস্য হন। উপসম্পদা লাভের পর হতে নিয়মিতভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য অনুশীলনীয় সকল নিয়ম-নীতি পালন করতে হয়।

নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু আচার্য বা গুরুর কাছে নিয়মিতভাবে ধর্ম বিনয় শিক্ষা করেন। প্রয়োজনে গুরুর অনুমতি সাপেক্ষে উপযুক্ত অন্য আচার্যের অধীনেও শিক্ষা লাভ করতে পারেন। একজন ভিক্ষুকে উপাধ্যায় ও আচার্যের কাছে শিক্ষানুরাগী হয়ে কমপক্ষে পাঁচ বছর থাকতে হয়। এ সময় তিনি ভিক্ষুদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিসমূহ চর্চা করেন। পাতিমোক্খ নামক গ্রন্থে ভিক্ষুদের নিত্য প্রতিপাল্য ২২৭টি শীল বা অনুশীলনীয় নীতি বর্ণিত আছে। এগুলো প্রত্যেকটি যথাযথভাবে ভিক্ষুদের জানতে ও পালন করতে হয়।

পাঠ : ৫

সঙ্ঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান

বৌদ্ধধর্মে দান হলো একটি অন্যতম আচরণীয় বিষয়। তাই নানাভাবে নানা আঙ্গিকে বৌদ্ধধর্মে দানের অনুশীলন হয়। তন্মধ্যে সঙ্ঘদান এবং অষ্টপরিষ্কার দান অন্যতম। নিচে পৃথকভাবে সঙ্ঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রদান করা হলো।

সঙ্ঘদান : সঙ্ঘকে উপলক্ষ করে দান করাই হলো সঙ্ঘদান। সঙ্ঘ বলতে ভিক্ষুদের সমষ্টিকে বোঝায়। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর একত্র করণকেই সঙ্ঘ বলা হয়। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন, একজন ভিক্ষুকে দান দেয়ার চেয়ে সঙ্ঘকে উদ্দেশ্য করে দান করা উত্তম মঙ্গল। চূল্লবগ্গ গ্রন্থে সঙ্ঘকে 'অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র' বা দানের উত্তম পাত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ সঙ্ঘকে দান করলে ইহ ও পরকালে সর্বাধিক পুণ্যফল লাভ করা যায়।

সঙ্ঘদান যে কোনো দিন গৃহে বা বিহারে করা যায়। সাধারণত গৃহেই সঙ্ঘদান করা হয়। তবে ভিক্ষুদের মধ্যাহ্ন আহারের পূর্বেই সঙ্ঘদান সম্পন্ন করতে হয়। বিভিন্ন উপলক্ষে সঙ্ঘদান আয়োজন করা যায়। যেমন : শিশুর জন্ম, অন্নপ্রাসন, বিয়ে, গৃহ নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে কোনো শুভ উদ্যোগের প্রারম্ভে বা সাফল্যে সঙ্ঘদান আয়োজন করা হয়। তবে পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে অবশ্যই সঙ্ঘদান করতে হয়। আবার প্রয়াত জ্ঞাতিবর্গের সদগতি কামনা করে সঙ্ঘদান করা যায়। সঙ্ঘদানে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতি আবশ্যক। এ জন্য শ্রদ্ধাচিত্তে পাঁচজন বা ততোধিক ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। সঙ্ঘদানের দানীয় সামগ্রী দান চেতনায় প্রফুল্লচিত্তে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত, সঙ্ঘদানে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে ভিক্ষুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সামগ্রী দান করা হয়। নিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণের উপযুক্তভাবে বসার ব্যবস্থাসহ দানীয় বস্তু সুন্দরভাবে সাজিয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। সঙ্ঘদান অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করা হয়। তারপর ভিক্ষুগণ পরিত্রাণ সূত্র পাঠ ও ধর্মদেশনা করেন। অতঃপর, একজন প্রাজ্ঞ গৃহী সঙ্ঘদানের গাথা আবৃত্তি করে দানীয় সামগ্রী উৎসর্গ করেন। গাথাটি নিম্নরূপ :

'ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, পূজেম।

দুতিযম্পি 'ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, পূজেম।

ততিযম্পি 'ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, পূজেম।

বাংলা অনুবাদ : নানাবিধ উপকরণসহ এ দান ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

দ্বিতীয় বার নানাবিধ উপকরণসহ এ দান ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

তৃতীয়বার নানাবিধ উপকরণসহ এ দান ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

অতঃপর ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেতভাবে করণীয় মেত্ত সূত্রটি আবৃত্তি করেন। তারপর সঙ্ঘদানের পুণ্যফল 'পুণ্যানুমোদন গাথা' উচ্চারণের মাধ্যমে জল ঢেলে মৃত জ্ঞাতিবর্গ, সমবেত দেবতাগণ এবং সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে দান করা হয়। তারপর ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। শেষে আমন্ত্রিত জ্ঞাতি বন্ধুদের আপ্যায়ন করা হয়। সঙ্ঘদানের ফলে অশেষ পুণ্যরাশি অর্জিত হয়। বুদ্ধ বলেছেন, 'পৃথিবী, সাগর, মেরুপর্বত যুগে যুগে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু লক্ষ কল্পেও সঙ্ঘদানের ফল ক্ষয় হয় না।

অষ্ট পরিষ্কার দান : এ দান অনুষ্ঠানও সঙ্ঘদান অনুষ্ঠানের মতো। তবে এ দানে ভিক্ষুদের নিত্য ব্যবহার্য আটটি বস্তু দান করা বাধ্যতামূলক। দ্রব্যসমূহ ভিক্ষুদের পরিচ্ছন্ন ও নিরোগ জীবন যাপনে সহায়ক। যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় আটটি দ্রব্য দান করা হয় তাকে অষ্টপরিষ্কার দানানুষ্ঠান বলা হয়। অষ্টপরিষ্কার বা আট পদের দানীয় দ্রব্য হলো : সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ছুরি বা ক্ষুর,

সুঁচ-সূতা, কটিবন্ধনী ও জলছাঁকনি। এগুলো ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। অষ্টপরিষ্কার দান করার সময় নিম্ন বর্ণিত গাথাটি আবৃত্তি করতে হয় :

'ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, পূজেম।

দুতিয়ম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, পূজেম।

ততিয়ম্পি ইমং ভিক্খং অট্ঠপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, পূজেম।

বাংলা অনুবাদ : এই আট প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দানীয় বস্তু ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

দ্বিতীয়বার এই আট প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দানীয়বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

তৃতীয়বার এই আট প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দানীয় বস্তু ভিক্ষুসংঘকে দান দিলাম ও পূজা করলাম।

যেহেতু, ভিক্ষুরা গৃহত্যাগী এবং ভিক্ষান্নে নির্ভরশীল সেহেতু তাঁদের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় আটটি দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো গৃহীদের দান করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন –

তিচীবরঞ্চ পত্তঞ্চ বাসী সূচিকাযবন্ধনং,

পরিসসাবণঞ্চ দেতি দাযকো তুট্ঠমানসো,

যুত্তযোগেন সাসনে এবং হি দাতব্বং সদা।

বাংলা অনুবাদ : দায়কগনের সন্তুষ্ট মনে ত্রিচীবর, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সুঁচ, কটিবন্ধনী, জল ছাঁকনি ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে সর্বদা দান করা উচিত।

অষ্টপরিষ্কার দানের সুফল অনেক। নিচে অষ্টপরিষ্কার দানের কতিপয় সুফল বর্ণনা করা হলো :

১। ত্রিচীবর (সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্ঘ এবং অন্তর্বাস) দানের ফলে জন্মজন্মান্তরে কখনোই পরিধেয় বস্ত্রের অভাব হয় না। তিনি সর্বদা সুন্দর বর্ণের অধিকারী হন।

২। ভিক্ষাপাত্র দানের ফলে দাতা জন্মজন্মান্তরে ধন-সম্পদের অধিকারী হন।

৩। ক্ষুর দানের ফলে দাতা প্রজ্ঞাবান হন।

৪। সুঁচ-সুতা দানের ফলে দাতা সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং শিল্পকর্মে সুদক্ষ হন। তিনি সর্বত্র পূজিত হন।

৬। জল ছাঁকনী দানের ফলে দাতা ভয় ও রোগমুক্ত হয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

উপরে বর্ণিত অষ্টপরিষ্কার দানের ফল বিবেচনা করে প্রত্যেক বৌদ্ধকে জীবনে অন্তত পক্ষে একবার অষ্টপরিষ্কার দান করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাদের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বলা হয়?

সঙ্ঘদানে কমপক্ষে কতজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকতে হয়?

অষ্টপরিষ্কার দানের দানীয়বস্তুর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উপসম্পদা লাভের ন্যূনতম বয়স কত ?

ক. ৭ বছর
খ. ১৯ বছর
গ. ২০ বছর
ঘ. ২৯ বছর

২। নির্বাণে উপনীত হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য –

ক. শীল পালন
খ. সংসার ত্যাগ
গ. কুশল কর্ম সম্পাদন
ঘ. প্রব্রজ্যা গ্রহণ

নিচের তালিকাটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ক্রমিক নং	দানীয় বস্তু
১.	সঙ্ঘাতি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস
২.	ভিক্ষাপাত্র
৩.	ক্ষুর
৪.	সুঁচ-সুতা
৫.	কটিবন্ধনী
৬.	জল ছাঁকনী

৩। তালিকায় বর্ণিত বস্তু দ্বারা কোন দান সম্পাদন করা যায় ?

ক. সঙ্ঘদান
খ. অষ্টপরিষ্কার দান
গ. চীবরদান
ঘ. পিন্ডদান

৪। উক্ত দান সম্পাদনের ফলে বৌদ্ধরা লাভ করবে –

i. শান্তি ও সমৃদ্ধি
ii. সামাজিক মর্যাদা
iii. জীবনে বহুবিধ উন্নতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অংক্যসিং মারমা একজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। জে.এস.সি পরীক্ষার পর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন নিয়ে বিহারে উপস্থিত হয়। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও অন্যান্য দানীয় বস্তু সামনে রেখে সবাই পঞ্চশীল গ্রহণ করলেন। এরপর শ্রদ্ধেয় ভান্তের আদেশে অংক্যসিং আরও কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো এই কথাগুলো ভান্তের সুরে সুরে উচ্চারণ করেন। এরপর পনের দিন যাবৎ বিহারে অবস্থান করে নিজ কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়। তার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে।

ক. কতজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সঙ্ঘদান করা হয় ?

খ. সাত বছরের কম বয়সের ছেলেকে প্রব্রজ্যা দেয়ার বিধান নেই কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. অংক্যসিং মারমা ভান্তের নিকট যে দীক্ষা নিল তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে অংক্যসিং মারমা কী সুফল লাভ করবে – বিশ্লেষণ কর।

২। **ঘটনা-১ :** অন্তর বড়ুয়া পেশায় দিন মজুর। তা সত্ত্বেও পিতার বাৎসরিক তিথিতে ভিক্ষু সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে যথাসময়ে পিণ্ডদান দিলেন।

ঘটনা-২ : প্রতীক চাকমা চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তিনি রাজবন বিহারে গিয়ে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুদের অপরিহার্য জিনিস দান করার জন্য মনঃস্থির করলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে রাজবন বিহারে পৌঁছে উক্ত দানকার্য প্রফুল্লচিত্তে সম্পন্ন করেন।

ক. শ্রমণ থেকে ভিক্ষুত্বে উপনীত হওয়ার নাম কী ?

খ. পিন্ডদান বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-২ কোন দানের সাথে সম্পৃক্ত ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. গৌতমবুদ্ধ ..... সূত্রে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের উপদেশ দিয়েছেন।

২. পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে বৌদ্ধ রীতিতে সন্ন্যাস অবলম্বনের নাম .....।

৩. প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে প্রথমে ..... অনুমোদন নিতে হয়।

৪. প্রব্রজ্যা এক প্রকার ..... জীবন চর্চা।

৫. উপসম্পদা হচ্ছে উচ্চতর নিয়ম-নীতি সম্পাদনের .....।

৬. সঙ্ঘকে উপলক্ষ করে দান করাই হলো .....।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কীভাবে কোন জাতির উন্নতি ছাড়া কখনো অবনতি হয় না?

২. কত বছরের কম বয়সে প্রব্রজ্যা দেওয়ার বিধান নাই এবং কেন?

৩. কেন সরাসরি উপসম্পদা প্রদান করা হয় না?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কীভাবে সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় হয় লেখ।

২. প্রব্রজ্যা গৃহীদের জন্য কেন সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল কাজ বর্ণনা কর।

৩. উপসম্পদা গ্রহণের নিয়মসমূহ লিপিবদ্ধ কর।

৪. সঙ্ঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দানের পরিচয়সহ এ দুইয়ের মধ্যে মিল ও অমিলগুলো লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

চরিতমালা

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে থের-থেরীর অবদান অপরিসীম। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হিসেবে যাঁরা দশ বছর জীবন অতিবাহিত করেছেন তাঁদেরকে থের ও থেরী বলা হয়। থেরকে স্থবিরও বলা হয়। স্থবির অর্থ সাধনায় স্থিত থাকা। থের, থেরী, স্থবির প্রভৃতি উপাধি বিশেষ। প্রবীণ, জ্ঞানী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ এসব উপাধি প্রাপ্ত হন। মহৎ কর্মগুণে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁরা কীভাবে মহৎ জীবন গঠন করেছিলেন তার বর্ণনা বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনী এবং ভাষিত গাথাগুলো আমাদের নৈতিক জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। বুদ্ধের সময় ও বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক বৌদ্ধ মনীষী বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁদের জীবন দর্শন থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। জীবনকে সুন্দর করার জন্য সেসব থের-থেরী ও বরেণ্য মনীষীদের জীবন চরিত পাঠ করা উচিত। এ অধ্যায়ে আমরা স্থবির অনুরুদ্ধ, স্থবির অঙ্গুলিমাল, মহিয়ষী নারী মল্লিকা দেবী এবং বিখ্যাত অট্ঠকথা রচয়িতা বুদ্ধঘোষ সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী ব্যাখ্যা করতে পারব।
* থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

স্থবির অনুরুদ্ধ

স্থবির অনুরুদ্ধ স্মরণীয় এক বুদ্ধ শিষ্যের নাম। তিনি একান্ত প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে জন্ম-জন্মান্তরে সাধনা করতে হয়েছে। তিনি এক এক জন্মে এক এক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে। গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধদের একজন ছিলেন পদুমুত্তর বুদ্ধ।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে তিনি এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মশ্রবণের জন্য একদিন তিনি বিহারে গিয়েছিলেন। তখন পদুমুত্তর বুদ্ধ দিব্যচক্ষুসম্পন্ন এক ভিক্ষুকে ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসনে নিয়োগ দান করেন। তিনিও সেই পদ প্রার্থী হয়ে বুদ্ধ প্রমুখ লক্ষ ভিক্ষুকে এক সপ্তাহ ধরে দান করেন। পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন যেন গৌতম বুদ্ধের সময় তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

পরে কশ্যপ বুদ্ধের সময় বারাণসীতে এক ধনী পরিবারে তিনি জন্ম নেন। কশ্যপ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কালে তিনি কনকচৈত্যের চারদিকে ঘৃতপূর্ণ তাম্রপাত্রে প্রদীপ পূজা করেছিলেন। সে ঘৃতভান্ড মাথায় ধারণ করে সারারাত চৈত্য প্রদক্ষিণ করেন। মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে উৎপন্ন হন। সেখান থেকে আয়ুশেষে পুনরায় বারাণসীতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল অন্নভার। তিনি সুষম নামক এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে কাজ করতেন। একদিন উপরিট্ঠ নামক এক পচ্চেকবুদ্ধ ভিক্ষা করেছিলেন। পচ্চেকবুদ্ধকে

দেখে অন্নভার নিজের খাদ্যের অংশ তাঁকে দান করে দেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশত গৃহপত্নীর অংশও দান করে দেন। নিজেদের জন্য বিন্দু মাত্র অবশিষ্ট না রেখে দান করে দেয়া এক বিরল ঘটনা। এ ঘটনা দেখে দেবতারাও বিস্মিত হলেন।

শ্রেষ্ঠী অন্নভারের উত্তম দানের কথা শুনে তিনি অন্নভারকে একহাজার মুদ্রা পুরস্কৃত করলেন। মনে মনে তিনিও এর পুণ্যাংশ কামনা করেন। সেদিন থেকে শ্রেষ্ঠী অন্নভারকে গৃহকর্ম করতে দিতেন না। তিনি অন্নভারকে বাণিজ্যকর্ম দ্বারা জীবন যাপন করতে বলেন। একদিন রাজদর্শনে যাবার সময় শ্রেষ্ঠী অন্নভারকে সঙ্গে নিলেন। রাজা শ্রেষ্ঠীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করলেন। শ্রেষ্ঠী রাজাকে বললেন, মহারাজ অন্নভার অত্যন্ত পুণ্যবান। আমি একহাজার মুদ্রা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পুণ্যাংশ গ্রহণ করেছি।

রাজাও সন্তুষ্ট হয়ে অন্নভারকে একহাজার মুদ্রা প্রদান করলেন। তাঁকে পছন্দমত একটি স্থান নির্বাচন করে বসতি স্থাপন করে বাণিজ্যকর্ম দ্বারা জীবন যাপন করতে উপদেশ দিলেন।

অন্নভার যেদিন পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ডদান করেছিলেন সেদিন থেকে পুণ্যফল ভোগ করতে থাকেন। রাজার নির্দেশে তিনি বাড়ি তৈরির জন্য নির্দিষ্ট স্থান পরিষ্কার করছিলেন। উঁচু নিচু স্থান সমতল করার সময় নিধিকুম্ভ উঠতে লাগল। সে ধনরত্নের কলসে সমস্ত স্থান পূর্ণ হলো। তিনি তা দেখে রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা সে ধনস্তূপ দেখে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এরূপ ধন আমার রাজ্যে অন্য কারও আছে কি? সকলে একবাক্যে উত্তর দিল– না মহারাজ, কারও নেই। সেদিন থেকে তাঁর নাম রাখা হয় ধনশ্রেষ্ঠী।

এভাবে তিনি বহু জন্ম কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। অতঃপর গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মেই তার নাম রাখা হয় অনুরুদ্ধ। পিতার নাম ছিল অমিতোদন। অমিতোদন ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের ভাই। অনুরুদ্ধের চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও কোমল। এ মহাপুণ্যবান ব্যক্তি পরম সুখেই দিন যাপন করেছিলেন। পিতা তার জন্য তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি দেবকুমারের ন্যায় দিব্যসুখ ভোগ করতে থাকেন। একদিন তিনি রাজা শুদ্ধোদন কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ভদ্দিয়কুমার প্রভৃতির সঙ্গে অনুপ্রিয় আম্রবনে গমন করে বর্ষাকালেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই বর্ষার মধ্যেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তারপর ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের নিকট কর্মস্থান ভাবনা গ্রহণ করে প্রাচীনবংশ নামক বনে গমন করেন। একদা তিনি সপ্তমহাপুরুষ বিতর্ক সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু তিনি অষ্টম বিতর্ক কিছুতেই করতে পারছিলেন না। বুদ্ধ তাঁকে তা জ্ঞাপন করে আর্যবংশ সূত্র দেশনা করেন। অনুরুদ্ধ সেই দেশনা অনুসারে ভাবনা করে অর্হত্ব ফল লাভপূর্বক অনেক প্রীতিগাথা ভাষণ করেন। নিচে তাঁর ভাষিত গাথার সারমর্ম দেয়া হলো :

'প্রতিদিন আমি' নৃত্য-গীত দ্বারা পূজিত হতাম। সকালে নৃত্যতালে আমাকে জাগ্রত করা হতো। এই ভোগ-বিলাসিতা দ্বারা আমি শুদ্ধিলাভ করতে পারিনি। এসব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে আমি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হই। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ত্যাগ করে ধ্যান করতে শুরু করি। এভাবে আমি আসক্তি মুক্ত হই। যিনি যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত করেন, আলস্য ত্যাগ করে উদ্যমশীল হন, তাঁর বোধিপক্ষীয় কুশলধর্মগুলো উৎপন্ন হয়। যখন আমার চিত্তে বিতর্ক উদিত হয়েছিল তখন তথাগত বুদ্ধ আমাকে ধর্ম-দেশনা করেন। আমি তাঁর ধর্ম-দেশনা অনুসরণ করে ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ করে বুদ্ধশাসনে কৃতকার্য হই।

পাঠ : ২

স্থবির অঙ্গুলিমাল

কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজপুরোহিত ছিলেন ভার্গব নামে এক ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণের ঘরে অঙ্গুলিমালের জন্ম। ব্রাহ্মণ পুত্রসন্তান লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। অঙ্গুলিমাল পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে গৌতমবুদ্ধের সময় এ রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মক্ষণে সমস্ত নগরের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করল। শয়ন কক্ষে রাজার মঙ্গলায়ুধ হতে জ্যোতি বের হলো। এতে রাজা ভীত সন্ত্রস্ত হন। সারারাত রাজার ঘুম হলো না। পুরোহিত ঐ লক্ষণ দেখে চিন্তিত হলেন। তিনি শাস্ত্র পর্যালোচনা করে তাঁর ছেলের জন্ম নক্ষত্র জ্ঞাত হলেন। অতঃপর তিনি সকালে রাজাকে দর্শন করতে গেলেন। আলাপচারিতায় জানতে পারলেন রাজা সারারাত ঘুমাতে পারেননি। রাজা পুরোহিতের নিকট অস্ত্রাগারে আগুনের ফুলকি ওঠার কারণ জানতে চাইলেন। পুরোহিত বললেন, 'মহারাজ ! ভয় করবেন না। আমার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। চোর নক্ষত্রে তার জন্ম। তাই এরূপ অদ্ভুত কান্ড হয়েছে।'

রাজা বললেন, ভবিষ্যতে সে কেমন হবে? পুরোহিত বললেন, মহারাজ, চোর নক্ষত্রে জন্ম হওয়ায় সে ভবিষ্যতে দস্যু হবে। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, সে একাকী দস্যু হবে নাকি দলবদ্ধ হয়ে দস্যুপনা করবে? পুরোহিত বললেন মহারাজ, একাই করবে। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তাকে হত্যা করব কি? এ প্রশ্নে পুরোহিত নীরব রইলেন। রাজা পুনরায় বললেন, 'যদি একাকী দস্যুতা করে সে কী আর করতে পারবে? তাকে দমন করার শক্তি কোশল রাজার আছে। তাকে আপনি লালন করতে পারেন।' কোশল রাজার অনুমতি পেয়ে পুরোহিত তার পূত্রকে পালন করতে লাগলেন। জন্মক্ষণে রাজার মনে দুঃখ দিয়েছিল বলে এ শিশুর নাম রাখা হয় 'হিংসক'। কিন্তু পরে তার আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে সবাই তাকে 'অহিংসক' নামে ডাকত। পূর্বজন্মের সুকর্মের ফলে তার দেহে সপ্ত হস্তীর বল ছিল।

অহিংসককে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলায় পাঠানো হলো। সে পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে ওঠে। সে সময়ের রীতি অনুসারে আচার্যের সেবায়ও সে খুব দায়িত্বশীল ছিল। সে আচার্য ও তাঁর পত্নীকে যত্ন সহকারে সেবা করত। অল্প সময়ের মধ্যে সে সকল শাস্ত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিল। সমগ্র বিদ্যালয়ে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণপত্নীও তাকে খুব আদর-যত্ন করতেন। কিন্তু অন্যান্য ছাত্রদের তা সহ্য হতো না। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আচার্যের কান ভারী করে তুলল। আচার্য ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে চরম শাস্তি প্রদানে উদ্যত হলেন।

আচার্য ভাবলেন, অহিংসক খুব শক্তিশালী ও মেধাবী। তাকে কৌশলে মেরে ফেলতে হবে। একদিন ছুটি হলে কুমার অহিংসক নগরে যাচ্ছিল। এ সময় আচার্য তাকে ডেকে বললেন, দেখ, তোমার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়েছে। আমাকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে তোমার এখন নিজগৃহে যাওয়া উচিত। অহিংসক বলল, 'আচার্য! উত্তম কথা।' আপনাকে কিরূপ দক্ষিণা দেব? আচার্য বললেন, 'আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ মানুষের ডান হাতের এক হাজার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিতে হবে।' আচার্য ভেবেছিলেন নরহত্যা করলে লোকে তাকে মেরে ফেলবে।

অহিংসক গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। গুরুর ইচ্ছা পূরণে সে তৎপর হলো। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জালিনী বনে বাসস্থান তৈরি করল অহিংসক। বনটি ছিল আটটি রাজ্যের চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

বহুলোক এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করত। এ বনে অবস্থান করে সে গুরুকে দক্ষিণা দেয়ার জন্য নরহত্যা শুরু করল। অহিংসেক একেকটি নরহত্যা করে বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে মালা আকারে গেঁথে গলায় ধারণ করত। সেজন্য সে অঙ্গুলিমাল নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সংবাদ ক্রমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অঙ্গুলিমালের নৃশংসতায় কোশল রাজ্যের জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। সকলের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা। সবাই মরণভয়ে ভীত। কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছে এ সংবাদ প্রেরণ করা হলো। তিনি নরঘাতক দস্যুকে ধরার জন্য কিছু সৈন্য প্রেরণ করলেন। পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য পিতা কোনো চেষ্টাই করলেন না। কিন্তু মা মন্তানী ছেলের এ বিপদে অস্থির হলেন। শেষে পাগলিনীর মতো ছুটে চললেন জালিনী বনের দিকে। পথিকরা কত নিষেধ করল। সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। দস্যু হলেও নিজের পুত্র। তার জীবন রক্ষা করতেই হবে।

সে সময় ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করছিলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে অবগত হলেন যে, অঙ্গুলিমাল পূর্বজন্মের বহু সুকৃতির অধিকারী। এই মুহূর্তে ধর্মবাণী শ্রবণ করলেই তার জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হবে। তখন বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের পাশবিক শক্তিকে দমন করার জন্য মনস্থির করলেন। মাতৃহত্যা মহাপাপ। এ মুহূর্তে মাতৃহত্যা তার পূর্বজন্মের সুফলকে ম্লান করে দেবে। তার জ্ঞানচক্ষু লাভ চিরতরে রুদ্ধ হবে। সে আজ নিজ মাতাকে হত্যা করে গুরুদক্ষিণা দেবে। বুদ্ধ সে নারীর প্রাণরক্ষার্থে এবং অঙ্গুলিমালকে মাতৃহত্যাজনিত পাপ হতে রক্ষা করার জন্য ঘটনাস্থলে যাত্রা করলেন। সে দিনটি ছিল অঙ্গুলিমালের নরহত্যার শেষ দিন। সে নয়শ' নিরানব্বইটি মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি সংগ্রহ করেছে। মাত্র আর একটি বাকি। একজন লোক হত্যা করতে পারলেই তার বাসনা পূর্ণ হবে। অঙ্গুলিমাল তার মাতাকে দূর থেকে আসতে দেখল। তখন অঙ্গুলিমালের মনে মাতা-পুত্রের সম্পর্কের লেশমাত্র প্রভাব নেই। অঙ্গুলি সংগ্রহই তার প্রধান লক্ষ্য। সে খড়্গ তুলে তার মায়ের দিকে

বুদ্ধকে বন্দনারত আঙ্গুলিমাল

ধাবিত হলো। ঠিক সে সময় সমস্ত বনভূমি আলোকিত করে বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের সামনে আবির্ভূত হলেন। এ সময় অঙ্গুলিমাল চিন্তা করল এ বৃদ্ধ নারীকে হত্যার পূর্বে মুণ্ডিতকেশ গৈরিক বসনধারী ভিক্ষুকে হত্যা করব। এরূপ ভেবে আবার বুদ্ধের দিকে ছুটতে লাগল। কী আশ্চর্য! ক্রমাগত ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করেও সে বুদ্ধকে ধরতে পারছিল না। সে ক্লান্ত হয়ে ভাবল আমার দ্রুতগামী অশ্বকে ধরতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমি একজন শ্রমণকে ধরতে পারছি না। আশ্চর্য ব্যাপার! এরূপ চিন্তা করে অঙ্গুলিমাল বিকট চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও শ্রমণ। ভগবান বললেন, 'অঙ্গুলিমাল, আমি স্থির আছি, তুমি স্থির হও।' বুদ্ধের একথা শুনে সে চিন্তা করল, শ্রমণগণ সত্যবাদী, অথচ স্থির হওয়ার জন্য আমাকে বলছেন। তার কারণ কী? সে আর এক পাও অগ্রসর হতে পারল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। বুদ্ধ বললেন, 'আমি সর্বদা প্রাণীদের প্রতি দন্ড-দান থেকে বিরত থাকি। তাই স্থির। তুমি প্রতিনিয়ত প্রাণী হত্যায় রত আছ। তাই অস্থির। তা শুনে অঙ্গুলিমালের পাষাণ হৃদয় করুণারসে সিক্ত হলো। অস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করল। বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল। বুদ্ধ 'এসো ভিক্ষু' বলার সঙ্গে সঙ্গে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর লাভ করে উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন। পরে ধ্যানে মগ্ন হয়ে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অর্হত্ব লাভ করে তিনি বিমুক্তি সুখে অনেক আনন্দগাথা উচ্চারণ করেছিলেন। নিচে তাঁর ভাষিত গাথাগুলোর সারমর্ম দেয়া হলো :

'আমার কারণে যারা জ্ঞাতি বিয়োগ দুঃখ ভোগ করেছেন তারা আমার ধর্মকথা শ্রবণ করুন। আমার বাক্য শুনে সকলে বুদ্ধ শাসনে সৎকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত হোন। ধার্মিক কল্যাণ মিত্রের সেবা করুন। যাঁরা ক্ষান্তিশীলতার কথা বলেন, মৈত্রী ধর্মের প্রশংসা করেন তাঁদের নিকট ধর্ম শ্রবণ এবং যথাধর্ম আচরণ করুন। কাউকেও হিংসা করবেন না। নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে সকল প্রাণীকে নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করবেন। হস্তীকে অঙ্কুশ দ্বারা, অশ্বকে কশাঘাত দ্বারা দমন করে। পণ্ডিতগণ নিজেকে অর্হত্ব ফলের দ্বারা দমন করেন। আমি বুদ্ধ কর্তৃক বিনা দণ্ডে দমিত হয়েছি। পূর্বে আমার নাম হিংসক হলেও আমি অহিসংক নামে পরিচিত ছিলাম। আজই আমার অহিংসক নাম সত্যে পরিণত হয়েছে। আমি আর কাউকে হিংসা করি না।'

অনুশীলনমূলক কাজ

অঙ্গুলিমালের জন্মের সময় কী হয়েছিল লেখ।

আচার্য গুরুদক্ষিণা স্বরূপ অঙ্গুলিমালের নিকট কী চাইলেন?

পাঠ : ৩
মহাপ্রজাপতি গৌতমী

মহাপ্রজাপতি সুপ্রবুদ্ধের পরিবারে দেবদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রানি মহামায়ার কনিষ্ঠ বোন ছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন দুই বোনকেই বিয়ে করেন। জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের সন্তান রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন। সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের সপ্তাহকাল পরে তাঁর মাতা রানি মহামায়ার মৃত্যু হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমীই সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নন্দের মাতা। কথিত আছে, তিনি নিজ পুত্রের দেখাশোনার ভার ধাত্রীর ওপর অর্পণ করে নিজে সিদ্ধার্থ গৌতমকে প্রতিপালন

করতেন। গৌতম সিদ্ধার্থের গোত্রের নাম। গৌতমের লালন-পালনকালী হিসেবে তিনি মহাপ্রজাপতি গৌতমী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

পরিণত বয়সে রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যু হয়। এতে রাজ্য ও সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। এসময় তিনি সন্ন্যাস জীবন লাভে আগ্রহী হলেন। এজন্য কীভাবে কী করা যায় তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

সেসময় শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে রোহিনী নদীর জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। বুদ্ধ সে বিবাদ মীমাংসার জন্য বৈশালী থেকে কপিলাবস্তু যান। এতে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হয়। বিবাদ মীমাংসা হলে বুদ্ধ তাদেরকে কলহবিবাদ সূত্র দেশনা করেন। এসময় পাঁচশত শাক্যকুমার ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করেন। তাঁদের স্ত্রীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বৈশালীতে চলে যান। মহাপ্রজাপতি ও তাঁর সহচারিণীগণ হতাশ না হয়ে কেশ কর্তন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান করে বৈশালী পর্যন্ত বুদ্ধের অনুগমন করেন। তাঁরা ক্ষতবিক্ষত পায়ে বিহারে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয়বার বুদ্ধকে অনুরোধ জানান। শেষে আনন্দ থের তাঁদের ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেয়ার জন্য বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান। অবশেষে বুদ্ধ প্রার্থনা অনুমোদন করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বাসনা পূর্ণ হয়। নারীগণ সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন। তিনি প্রব্রজ্যা লাভ করলেন।

দীক্ষার পর তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বন্দনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে ধর্মোপদেশ দান করেন। তিনি ধর্মোপদেশ অনুসরণ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তার পাঁচশত সহচারিণী জেতবনে বুদ্ধের নিকট নন্দকোবাদ সূত্র শ্রবণ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে জ্ঞানে থেরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে মহাপ্রজাপতি গৌতমী নির্বাণ লাভ করেন।

তিনি বুদ্ধের অনুমতি গ্রহণ করে নানাবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শনের পর দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় যেসব অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল সেরূপ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়ও সংঘটিত হয়েছিল। যেমন সকলের প্রার্থনা শেষে তাঁর শ্মশান স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। মহাপ্রজাপতি অর্হত্ব প্রাপ্তির পর মনের সুখে অনেক প্রীতিগাথা উচ্চারণ করেছিলেন। নিচে তাঁর ভাষিত কয়েকটি গাথার বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো :

১. সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বা বুদ্ধবীরকে নমস্কার করছি। তিনি আমার এবং অন্যান্য বহুজনের দুঃখমোচন করেছিলেন।

২. সর্বদুঃখের কারণ আমার জ্ঞাত হয়েছে। অশুভর হেতু তৃষ্ণা আমার এখন বিশুষ্ক হয়েছে। আমি দুঃখের নিবৃত্তির কারণ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণ করেছি।

৩. পূর্বে আমার জ্ঞান অপরিপক্ক ছিল। তাই আমি লক্ষ্যহীনভাবে মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, মাতামহীরূপে কতবার জন্মেছি।

৪. সর্বদা শ্রাবক সঙ্ঘের গুণাবলির দিকে লক্ষ রাখবে। তাঁরা দৃঢ় পরাক্রমশালী, উদ্যমশালী, ধ্যানপরায়ণ ও বীর্যবান। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিচরণশীল। তাঁদের পথ অনুসরণ করবে।

৫. কী আশ্চর্য! বহুজনের হিতার্থে মহামায়া সিদ্ধার্থকে প্রসব করেছিলেন। সত্যিই তিনি কত গুণের আধার। সেই গৌতম জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণীগণকে রক্ষা করছেন। সকল দুঃখের বিনাশসাধন করেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

'মহাপ্রজাপতি গৌতমী' কীভাবে নামকরণ হয় লেখ।

নারীদের সঙ্ঘভুক্ত করার জন্য কে বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন?

পাঠ : ৪

মল্লিকাদেবী

পুণ্যশীলা মল্লিকাদেবী কুশীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুল সেনাপতির বিয়ে হয়। তিনি বিয়ের পর স্বামীর কর্মস্থল কোশল রাজ্যে গমন করেন। বন্ধুল ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের সেনাপতি। শ্রাবস্তীর জেতবনে ভগবান বুদ্ধ যখন অবস্থান করতেন মল্লিকাদেবী সেনাপতির স্ত্রী হয়েও দিনে দুবার ত্রিরত্নের সেবা করতে বিহারে যেতেন।

মল্লিকাদেবী বুদ্ধসহ বিহারের সকল ভিক্ষুসংঘকে সকালে প্রাতঃরাশ দান করতেন। বিকালে ধর্ম শ্রবণের সময় তাঁদের জন্য পানীয় ও পঞ্চ ভৈষজ্য নিয়ে যেতেন। এছাড়া তাঁদের গৃহেও পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে খাদ্যভোজ্য দান করা হতো।

দীর্ঘকাল সংসার করেও মল্লিকাদেবীর কোনো সন্তান হলো না। তিনি নিঃসন্তান বলে তাঁর স্বামী তাঁকে পিতৃগৃহে চলে যেতে বললেন। স্বামীর আদেশ মেনে নিয়ে তিনি পিতৃগৃহ কুশীনগরে রওনা হলেন। যাবার পথে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে তিনি বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করলেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে তিনি স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে মন স্থির করলেন। তখন তিনি পিতৃগৃহে না গিয়ে স্বামীগৃহে ফিরে গেলেন। তাকে দেখে বন্ধুল সেনাপতি বললেন, ফিরে এলে কেন? মল্লিকাদেবী বললেন, ভগবান বুদ্ধ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বন্ধুল সেনাপতি চিন্তা করলেন তথাগত ভবিষ্যত দ্রষ্টা। হয়তো আমার বংশ রক্ষা হবে। তাই তিনি মল্লিকাকে আমার নিকট ফেরত পাঠিয়েছেন। কিছুদিন পর মল্লিকা সন্তানসম্ভবা হলেন। তাঁর দুটি যমজ সন্তান হলো। এভাবে বন্ধুলের ঔরসে মল্লিকার গর্ভে ষোলবার যমজ সন্তান হয়েছিল। প্রত্যেকেই সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তাঁরা এক সঙ্গে রাজবাড়িতে গেলে রাজাঙ্গন পূর্ণ হয়ে যেত। বিচারালয়ের বিচারকার্য থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র বন্ধুল সেনাপতির জয়ধ্বনি ঘোষিত হলো।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের মনে এক সময় সন্দেহ জাগ্রত হলো। একদিন এ বন্ধুল সেনাপতিই হয়তো রাজশক্তি কেড়ে নিতে পারে। তাই রাজা ষড়যন্ত্র করে বন্ধুল সেনাপতি ও তাঁর বত্রিশ পুত্রকে হত্যা করলেন।

যেদিন তাঁদের সবাইকে হত্যা করা হলো সেদিন মল্লিকাদেবী সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পিণ্ডদান করছিলেন। স্বামী ও পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ সম্বলিত পত্র পেয়েও তিনি ধৈর্য সহকারে পুণ্যকাজ সম্পন্ন করলেন। সারিপুত্র স্থবির এ প্রসঙ্গে উপদেশ দিলেন -

'কার কখন, কীভাবে মৃত্যু হয় কেউ বলতে পারে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপূর্ণ। জরা, ব্যাধি একদিন সবাইকে গ্রাস করবে। মৃত্যুই প্রাণিজগতের স্বভাবধর্ম। জন্ম মৃত্যুর কারণ না জেনে শোক করা বৃথা। শোকার্ত ব্যক্তি কৃশ ও বিবর্ণ হয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোনো লাভ হয় না। পুণ্য কর্মই মৃতব্যক্তির উপকারে আসে।'

দানকার্য শেষে মল্লিকাদেবী নিজ শোকার্ত পুত্রবধূদের ডেকে বললেন, 'তোমরা নিরাপরাধ। তোমাদের স্বামীগণ পূর্বকর্মের ফল ভোগ করেছে। শোক করো না। রাজার প্রতিও বিদ্বেষভাব পোষণ করো না। রাজা এ সংবাদ চরের মুখে শুনে মল্লিকার নিকট এসে ক্ষমা চাইলেন। পুত্রবধূরা স্ব স্ব পিত্রালয়ে চলে গেল। মল্লিকাদেবীও আপন পিত্রালয়ে আজীবন ত্রিরত্নের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলে তার সপ্তরত্নখচিত 'মহালতা প্রসাধন' দান করে ধাতুচৈত্য নির্মাণ করেন। তিনি যথাকালে দেহত্যাগ করে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ক্ষমাশীলতা অনুকরণীয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

মল্লিকাদেবী কার স্ত্রী ছিলেন?

মল্লিকাদেবী শোকার্ত পুত্রবধূদের কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৫

বুদ্ধঘোষ

বুদ্ধঘোষ ছিলেন বিখ্যাত পালি অট্ঠকথা রচয়িতা। 'অট্ঠকথা' শব্দের অর্থ অর্থকথা বা ভাষ্য। বুদ্ধঘোষ খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি, চূল্লবংস প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানকালের পণ্ডিতগণ মনে করেন, তিনি দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ত্রিবেদে পারদর্শীতা অর্জন করেন। তিনি বিতর্ক করে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও যুক্তির কাছে সকলেই পরাজিত হতেন। এমনি করে বিতর্ক করে বেড়ানোর সময় তিনি এক বিহারে এসে উপস্থিত হন। সেই বিহারে তিনি রেবত থেরর নিকট অভিধর্মের ব্যাখ্যা শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর কণ্ঠ বুদ্ধের মতো গম্ভীর, তাঁর দেশনা বুদ্ধের মতো হৃদয়গ্রাহী এবং মর্মস্পর্শী হওয়ায় দীক্ষার পর তিনি বুদ্ধঘোষ নামে খ্যাত হন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ত্রিপিটকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর, তিনি ঞাণোদয় (জ্ঞানোদয়) এবং ধর্মসঙ্গনীর অট্ঠকথা অত্থসালিনী রচনা করেন। তারপর তিনি পরিত্তট্ঠকথা গ্রন্থটি রচনা আরম্ভ করেন।

গুরু তাঁর পান্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হন। সে সময় ভারতে অট্ঠকথা ছিল না বলে গুরু তাঁকে সিংহলে গিয়ে সিংহলি ভাষায় সংরক্ষিত অট্ঠকথাসমূহ পালি ভাষায় রচনা করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। গুরুর নির্দেশে তিনি সিংহলের অনুরাধাপুরার মহাবিহারে গমন করেন। তখন সিংহলের রাজা ছিলেন মহানাম। সেখানে তিনি মহাবিহারের সঙ্ঘপ্রধান সঙ্ঘপাল থের'র নিকট থেরবাদ ও অট্ঠকথা অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাগ্রহণের পর তিনি পালি ভাষায় অট্ঠকথা রচনার উদ্দেশ্যে মহাবিহারে সংরক্ষিত গ্রন্থসমূহ প্রদানের জন্য সঙ্ঘপাল থেরকে অনুরোধ করেন। তখন মহাবিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁকে দুটি গাথা প্রদান করেন এবং গাথাদ্বয় ত্রিপিটকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে তাঁর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য আদেশ করেন। গাথাদ্বয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি বিখ্যাত বিসুদ্ধিমগ্গ বা বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিকে ত্রিপিটকের সারসংকলন বলা হয়। এ গ্রন্থটি রচনা করে তিনি প্রভূত যশ খ্যাতি অর্জন করেন। কথিত আছে যে, দেবতারা তাঁর যশ খ্যাতি প্রচারের জন্য গ্রন্থটি লুকিয়ে রাখেন। তখন তিনি পুনরায় আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয়বারও দেবতারা গ্রন্থটি লুকিয়ে রাখেন। তিনি পুনরায় গ্রন্থটি রচনা করে যখন সংঘের নিকট সমর্পণ করতে যাচ্ছিলেন তখন দেবতাগণ অপর দুটি গ্রন্থও যথাস্থানে রেখে যান। ভিক্ষুগণ তিনটি গ্রন্থ পাঠ করতে আরম্ভ করেন এবং দেখেন যে তিনটি গ্রন্থই হুবহু এক। তখন মহাবিহারের ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সিংহলের ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁর পাণ্ডিত্য ও লেখার দক্ষতা দেখে 'অট্ঠকথা' অনুবাদ করার অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি অনুরাধপুরার মহাবিহারের গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে অট্ঠকথা রচনা করতে থাকেন। তিনি ষোলটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। গ্রন্থগুলো হলো :

১। ঞাণোদয় (জ্ঞানোদয়) ২। অত্থসালিনী ৩। পরিত্তট্ঠকথা ৪। বিসুদ্ধিমগ্গ (বিশুদ্ধিমার্গ) ৫। সমন্তপাসাদিকা ৬। কঙ্কাবিতরণী ৭। সুমঙ্গলবিলাসিনী ৮। পপঞ্চসূদনী ৯। সারত্থপকাসিনী ১০। মনোরত্থপূরণী ১১। সম্মোহবিনোদনী ১২। পঞ্চপকরণট্ঠকথা ১৩। পরমত্থজোতিকা ১৪। ধম্মপদট্ঠকথা ১৫। জাতকট্ঠকথা এবং ১৬। বিসুদ্ধজনবিলাসিনী।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর বুদ্ধঘোষ সিংহলি অট্ঠকথা পালি ভাষায় অনুবাদ করে ভারতে ফিরে আসেন। এভাবে মহাপন্ডিত বুদ্ধঘোষ অট্ঠকথা রচনা করে বৌদ্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, বৌদ্ধধর্ম দর্শনকেও সহজতর করে তুলেছেন। কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্ঠকথা শব্দের অর্থ কী?

বুদ্ধঘোষ নামের বিশেষত্ব বর্ণনা কর।

বুদ্ধঘোষ রচিত গ্রন্থগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অহিংসক কোথায় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন?

ক. বিক্রমশীলায় খ. অনুরাধাপুরে

গ. নালন্দায় ঘ. তক্ষশীলায়

২। পুণ্যশীলা মল্লিকাদেবীর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় দিক –

i. ত্রিরত্নের সেবায় নিয়োজিত থাকা

ii. ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করা

iii. বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পুণ্যবতী স্বরূপা বড়ুয়া পরিণত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি প্রতিদিন সকালে বিহারের ভিক্ষুদেরকে প্রাতঃরাশ দান করতেন এবং সেবা শুশ্রূষার জন্য নিজেকে আত্মনিয়োগ করতেন। একদিন ভিক্ষুদের একাগ্রচিত্তে দান দেয়ার সময় পরিবারের দুঃসংবাদ শুনেও নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন।

৩। অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাটির সাথে কোন থেরীর ইঙ্গিত বহন করে ?

ক. মল্লিকাদেবীর খ. মহাপ্রজাপতি গৌতমীর

গ. ক্ষেমার ঘ. উৎপলবর্ণার

৪। উক্ত থেরীর কর্ম অনুসরণের মাধ্যমে পরকালে পুণ্যবতী স্বরূপা বড়ুয়া কী লাভ করতে পারেন ?

ক. স্বর্গলোক খ. দেবলোক

গ. ব্রহ্মলোক ঘ. মনুষ্যলোক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বরুনা চাকমা পেশায় সেবিকা। তিনি এক আত্মীয়ের দূর্ঘটনার কারণে তার নবজাত পুত্র সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব নেন। পুত্র বড় হলে জগতের আলোকপ্রাপ্ত মহাজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রুতিধর স্থবিরের নিকট বরুনা চাকমা প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং তা বাস্তবে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

ক. গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধের নাম কী ছিল?

খ. চরিতমালার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. বরুনা চাকমার ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহাথেরীর জীবনী ও গুণাবলি প্রতিফলিত হয়েছে–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত মহাথেরীর অর্হত্বফল বরুনা চাকমার ক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিফলন ঘটতে পারে? মূল্যায়ণ কর।

২। **ঘটনা-১ :** সপ্তদর্শী বড়ুয়া শিক্ষকের সন্তান হলেও তার ধ্যান-ধারণা অতি অসাধারণ ছিল। সংসারের প্রতি তার কোনো টান ছিল না। তাই প্রব্রজ্যা দীক্ষা নিয়ে সহজে ভিক্ষুত্বে পরিণত হলেন। তিনি বুদ্ধের নির্দেশিত অভিধর্মের ব্যাখ্যা গভীর তপস্যার মাধ্যমে সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি ও দেশনা করতে পারতেন।

ঘটনা-২ : সুজন এবং তার দাদু কমলাপুর বিহারে বেড়াতে গেলেন। সেখানে বুদ্ধের ছবির পাশে দণ্ডায়মান আর এক ছবি দেখে সুজন তার দাদুর কাছে জানতে চাইলেন ইনি কে? দাদু বললেন ইনি পূর্বে ক্রোধ ও হিংসাপরায়ণ ছিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ইনি হিংসা ক্রোধ ত্যাগ করে অহিংসক নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ক. পুণ্যবতী মল্লিকা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. মল্লিকাদেবীকে তার স্বামী পিত্রালয়ে যেতে আদেশ দিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ চরিতমালার কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ এ অঙ্গুলিমালের কাহিনীর প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ..... স্মরণীয় এক বুদ্ধ শিষ্যের নাম।

২. শয়ন কক্ষে রাজার ..... হতে জ্যোতি বের হলো।

৩. অহিংসককে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ..... পাঠানো হলো।

৪. শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে ..... জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল ।

৫. পুণ্যশীলা মল্লিকাদেবী ..... জন্মগ্রহণ করেন।

৬. বুদ্ধঘোষ ..... শতকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

মিলকরণ

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

বাম	ডান
ক. রাজা সন্তুষ্ট হয়ে	ত্যাগ করে ধ্যান করতে শুরু করি
খ. রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ	সকল শাস্ত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়
গ. অল্প সময়ের মধ্যে অহিংসক	অন্নভারকে এক হাজার মুদ্রা প্রদান করলেন
ঘ. অহিংসক গুরুর আদেশ	হিংসা করি না
ঙ. আমি আর কাউকে	শিরোধার্য করে নিল

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিদ্যালয়ে কেন অহিংসকের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল?

২. অহিংসকের নরহত্যা করার কারণ কী?

৩. বুদ্ধ কী কারণে বৈশালী থেকে কপিলাবস্তু গিয়েছিলেন?

৪. স্বামী ও পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মল্লিকাদেবী কী করেছিলেন?

৫. বুদ্ধঘোষ কেন সিংহলে গিয়েছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অনুরুদ্ধথের কীভাবে জন্ম-জন্মান্তরের প্রচেষ্টায় উন্নত জীবন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বর্ণনা কর ।

২. 'আজই আমার অহিংসক নাম সত্যে পরিণত হয়েছে'– এই বক্তব্যটি কে এবং কেন বলেছিলেন লেখ ।

৩. মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ভিক্ষুণী হওয়ার বিবরণ নিজের ভাষায় লেখ ।

৪. সারিপুত্র স্থবির মল্লিকাদেবীকে কোন বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন লেখ ।

৫. বুদ্ধঘোষ কীভাবে বৌদ্ধ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেছিলেন লেখ ।

নবম অধ্যায়

জাতক

জাতক ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের নানা কাহিনী ও ঘটনা বর্ণিত আছে। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের প্রসঙ্গক্রমে এসব কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করতেন। এসব কাহিনী মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া এসব কাহিনীতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। ফলে জাতক কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সামাজিক প্রভাব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সামাজিক প্রভাব এবং গৃধ্র জাতক, ভদ্রঘট জাতক, শিবি জাতক, বন্নুপথ জাতক, ন্যাগ্রোধমৃগ জাতক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
* জাতক পাঠের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা ও সমাধানের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
* জাতক পাঠ করে তৎকালীন ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
* জাতক কাহিনী বলতে পারব।

পাঠ : ১

জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা জাতক কী তা পড়েছি। এখন আমরা জাতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পড়ব। জাতকে প্রাচীন ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। তাই জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

জাতক পাঠে প্রাচীনকালের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। জাতক পাঠে জানা যায় যে, তখনকার সমাজে চার প্রকার বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণরা যাজক বা পুরোহিত ছিলেন। সমাজে তাঁদের অনেক প্রতিপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়রা রাজ্য শাসন করতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। শূদ্ররা ছিলেন শ্রমজীবি। সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। জাতকে চণ্ডাল নামক নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডালরা শ্মশানে, বৃক্ষের নিচে বা বনাঞ্চলে বসবাস করত। পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ কৃষি ও পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। নগরে প্রাসাদ, প্রমোদ-উদ্যান, মন্দির, ক্রীড়াভবন ও নৃত্যশালা ছিল। প্রাসাদগুলো ছিল কাঠের তৈরি। ধনী ও রাজন্য শ্রেণির লোকের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছিল শিকার, অস্ত্র চালনা, নৃত্য-গীত ইত্যাদি। রাজকন্যা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যারা খেলাধূলা ভালোবাসতেন। খেলায় পণ রাখার রীতি ছিল এবং পণে হেরে গিয়ে অনেকে সর্বস্বান্ত হতেন। উৎসবের সময় নাচ ও গান হতো।

সাপুড়েরা সাপ ও বানর নিয়ে খেলা দেখাত। বিবাহে পণ প্রথা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ পণ প্রথার নিন্দা করেন। তখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। জনসাধারণের প্রধান আহার ছিল ভাত, জাউ, মাছ, মাংস ইত্যাদি। উৎসবের সময় পায়েস ও পিঠা তৈরি করা হতো। স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কারের প্রচলন ছিল।

জাতকে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জাতক পাঠে সমুদ্র বাণিজ্যের কথা জানা যায়। বিভিন্ন রকম পণ্য নিয়ে বণিকেরা অর্ণবপোতের সাহায্যে সমুদ্র পাড়ি দিতেন। বিভিন্ন স্থানে নোঙ্গর করে পণ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ-রৌপ্য-প্রবাল নিয়ে ফিরে আসতেন। রাজারা প্রজাদের নিকট হতে কর সংগ্রহ করতেন। প্রজারা শস্যের একটি অংশ কর হিসেবে প্রদান করত। মুদ্রা ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। তবে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দেয়ার প্রথাও ছিল।

জাতক পাঠে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, প্রাচীন ভারত ষোলটি জনপদ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বুদ্ধের সময়কালে মগধ, কোশল, বজ্জি, মল্ল প্রভৃতি শক্তিশালী রাজ্য ছিল এবং বৈশালী, চম্পা, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি ছিল সমৃদ্ধশালী নগর। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, রাজা অজাতশত্রু, রাজা প্রসেনজিত, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। ভগবান বুদ্ধ 'মহাধর্মপাল' জাতক শুনিয়ে তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোদনকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি স্পন্দন, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম, দদ্দভ ও সম্মোদমান এই পঞ্চজাতক শুনিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের দীর্ঘদিনের বিরোধের অবসান ঘটিয়েছিলেন। শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতন্ত্র। রাজার হাতে ছিল শাসন ক্ষমতা। কিন্তু রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা বিদ্রোহ করত। অনেক সময় প্রজারা রাজা নির্বাচন করত।

জাতকে ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, জনগণ ধর্ম হিসেবে পূজা, যাগযজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করতো। পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। গুরুগৃহে শিক্ষা দেয়া হতো। গুরু মেধা অনুসারে শিক্ষার্থীকে নানা প্রকার শাস্ত্র ও শিল্প শিক্ষা দিতেন। জাতক পাঠে নারী শিক্ষার কথাও জানা যায়। দেশের রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা গুরুকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

উপরে বর্ণিত বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, জাতক প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক ও বাহক। তাই পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ জাতককে প্রাচীন জনজীবনের জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতককে কেন প্রাচীন জনজীবনের জীবন্ত ইতিহাস বলা হয়?

পাঠ : ২

জাতকের সামাজিক প্রভাব

জাতকের অনেক সামাজিক প্রভাব রয়েছে। জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশমূলক এবং মহাপুরুষের বাক্য। জাতকে কঠিন ধর্মতত্ত্বসমূহ কাহিনীর মাধ্যমে সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এজন্য নৈতিক জীবন গঠন ও ধর্মতত্ত্ব বোঝার জন্য জাতকের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। জাতকে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারটি ভাগে সমাজ জীবন বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা ছিলেন পুরোহিত বা যাজক শ্রেণির। সমাজে তাঁদের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তারা রাজ্য শাসন করতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং শূদ্ররা শ্রমজীবী ছিলেন। বুদ্ধ ছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। তিনি জন্ম নয়, কর্ম দ্বারাই মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করেছেন। জাতক জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য পরিহার করতে শিক্ষা দেয়। জাতকের কাহিনীগুলো নৈতিক উপদেশে সমৃদ্ধ। যেমন : লোভে পাপ পাপে মৃত্যু; ত্যাগ ও দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; চাটুকারিতার ফল কখনো ভালো হয় না; শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত ও প্রশংসিত হয় ইত্যাদি। এসব নীতিকথা মানুষকে অনৈতিক কর্ম পরিহার করে কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্য সমাজের দর্পন। সমাজ বিনির্মাণে সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। জাতকের কাহিনীগুলোতে গল্প ও উপন্যাস রচনার প্রচুর উপকরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কুশ জাতক থেকে পটভূমি গ্রহণ করে রাজা, শাপমোচন, অরূপরতন এ তিনটি নাটক রচনা করেন। জাতকের কাহিনী সমাজের অসামঞ্জস্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীভূত করার উপায় শিক্ষা দেয়। জাতক পাঠে সর্বজীবের প্রতি মায়া প্রীতি জন্মে। দানশীলতা, দয়াশীলতা, সহনশীলনতা, ক্ষমা ও পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি হয়। এসব গুণাবলি আমাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত থাকে। কুসংস্কার ত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করতে জাতক শিক্ষা দেয়। অতএব বলা যায়, সমাজজীবনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতকের উপদেশের একটি তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৩

গৃধ্র জাতক

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্র বা শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বুড়ো মা-বাবাকে দেখাশোনা করতেন। এক পর্বতের উপর শকুনদের নির্জন গুহায় তাঁরা থাকতেন। বোধিসত্ত্বরূপী গৃধ্র বারাণসীর শ্মশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা ও বাবাকে খাওয়াতেন। সেই শ্মশানে এক ব্যাধ মাঝে মাঝে শকুন ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রাখত। একদিন গৃধ্র সেখানে মৃত গরুর মাংস খুঁজতে গেলেন। শ্মশানে ঢুকতেই তিনি ফাঁদে আটকে পড়লেন। তখন তিনি ভাবলেন, আমি ফাঁদে আটকে গেলাম এজন্য আমার চিন্তা নেই, কিন্তু আমার বুড়ো মা-বাবাকে কে খাওয়াবে? কেমন করে তাঁরা জীবন বাঁচাবে? খেতে না পেলে তাঁরা পর্বতের গুহায় মারা যাবে।

এরূপ চিন্তা করার পর বিলাপ করতে করতে তিনি বললেন, "নিষ্ঠুর ব্যাধের ফাঁদে আমি আটকে পড়েছি। আমার আর উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই। কিন্তু আমার বুড়ো মা-বাবার কী হবে? তাঁদের দুর্দশা কে ঘোচাবে?"

গৃধ্রের এই বিলাপ শুনে ব্যাধ উত্তরে বলল, "কী দুঃখ তোমার, কিসের দুর্দশা? পাখি হয়েও মানুষের ভাষায় এভাবে কথা বলতে আমি কাউকে দেখিনি। কী অদ্ভুত ব্যাপার!"

গৃধ্র পুনরায় তাকে বললেন,

"আমার মা-বাবা খুব বৃদ্ধ। আমি তাঁদের ভরণ-পোষণ করি। কিন্তু এখন আমি তোমার ফাঁদে বন্দি। কে এখন তাঁদের দেখাশোনা করবে?"

ব্যাধ পুনরায় উত্তরে বলল,

"শকুনরা আকাশের অনেক উপর থেকেও মরা প্রাণী দেখতে পায়। কিন্তু তুমি কেন তা দেখতে পেলে না? কী তার কারণ?"

গৃধ্র পুনরায় উত্তর দিলেন,

"আয়ু শেষ হলে জীবগণ কাছের জিনিসও দেখতে পায় না। আমিও সে কারণে এই ফাঁদ দেখতে পাইনি।"

ব্যাধের ফাঁদে আটক গৃধ্র

তখন ব্যাধ তাঁকে বলল,

"তুমি নিজের জন্য না ভেবে বুড়ো মা-বাবার কথা ভাবছ দেখে আমি মুগ্ধ। সেজন্য তোমাকে আমি ফাঁদ থেকে মুক্তি দিলাম। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও, মা-বাবার সেবা কর।"

গৃধ্র ব্যাধের সহৃদয় কথা শুনে তাকে বললেন, "তুমি ব্যাধ হয়েও দয়াবান। এজন্য তোমার মঙ্গল হোক। আত্মীয়দের সঙ্গে তুমিও সুখী হবে। আমি আমার বুড়ো মা-বাবার কাছে চললাম।

বোধিসত্ত্বরূপী গৃধ্র মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ব্যাধকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর শ্মশান থেকে মুখে করে মাংস নিয়ে মা-বাবার কাছে চলে গেলেন।

উপদেশ : মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সত্যবাদীরা চরম বিপদ থেকে রক্ষা পান।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃধ্র কাদের কথা চিন্তা করছিলেন?

ব্যাধ কেন গৃধ্রকে মুক্ত করে দিল?

পাঠ : ৪

ভদ্রঘট জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রেষ্ঠীপদ প্রাপ্ত হন। তাঁর শ্রেষ্ঠীপদ প্রাপ্তির সময়ে গৃহে চল্লিশ কোটি ধন ভূগর্ভে নিহিত ছিল।

অনেক দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে শ্রেষ্ঠীরূপী বোধিসত্ত্ব মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পর দেবকুলে জন্মগ্রহণ করে দেবতাদের রাজা হন। সেই শ্রেষ্ঠীর ছিল একটি মাত্র পুত্র। সে ছিল খুবই উচ্ছৃঙ্খল। পিতার মৃত্যুর পর সে রাজপথের উপর এক মণ্ডপ নির্মাণ করল। সেখানে বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে সে সুরাপানে মত্ত থাকত। প্রমত্ত অবস্থায় সে সহস্র মুদ্রা বিলিয়ে দিত। কেবল নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ভোগ-বিলাসে সে নিমগ্ন থাকত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চল্লিশ কোটি ধন ও অন্যান্য সম্পত্তি নিঃশেষ করল। একদিন নিঃস্ব অবস্থায় জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে লাগল। দেবকুলে দেবতাদের রাজারূপী শ্রেষ্ঠী তাঁর পুত্রের দুর্দশার কথা জানতে পারলেন। একদিন স্নেহবশত তিনি পুত্রের নিকট উপস্থিত হন। তিনি পুত্রকে একটি ঘট প্রদান করে বললেন, "বৎস ! এই ঘটটিকে সাবধানে রাখবে, যাতে ভেঙে না যায়। এটা যতদিন তোমার কাছে অক্ষত থাকবে, ততদিন তোমার ধনের অভাব হবে না। এটির রক্ষণাবেক্ষণে যেন কোনো ত্রুটি না হয়।" তিনি পুত্রকে এই উপদেশ প্রদান করে পুনরায় দেবলোকে ফিরে গেলেন।

পুত্র ঘটের নিকট যা চাইত তা-ই পেত। ঘট প্রাপ্তির পর পুত্রটি পুনরায় ধনী হয়ে গেল। সে আবার আগের মতো দিবারাত্র মদ্য পানে রত হলো। সুবিধাভোগী বন্ধুবান্ধবরা আবার তাকে ঘিরে ধরল। অবশেষে একদিন উন্মত্ত অবস্থায় সে ঘটটিকে বারবার ঊর্ধ্বে ছুড়ে দিয়ে ধরতে লাগল। এরূপ করার সময় একবার সে আর ঘটটি ধরতে পারল না। সেটি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

শ্রেষ্ঠীপুত্র উন্মত্ত অবস্থায় ঘট উর্ধ্বে ছুড়ে মারছে

তখন সে ঘটের নিকট যা চাইত তা আর পেল না। সে পুনর্বার হতদরিদ্র হয়ে পড়ল। জীর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্বক ভগ্ন মৃৎপাত্র হাতে ভিক্ষা করতে লাগল। শেষে একদিন এক ব্যক্তির বাড়ির দেয়ালের পাশে অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণত্যাগ করল।

উপদেশ : উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম ভয়াবহ।

অনুশীলনমূলক কাজ

বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর পর কোথায় গেলেন?

উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণতি বর্ণনা কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৫

শিবি জাতক

প্রাচীনকালে শিবি রাজ্যের অরিষ্টপুর নগরে মহারাজ শিবি রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল শিবিকুমার। তিনি বাল্যকালে তক্ষশীলায় গিয়ে বিবিধশাস্ত্র শিক্ষা করেন। সেখান থেকে রাজধানী অরিষ্টপুর নগরে ফিরে এলে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পিতা তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ দান করলেন।

কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হলো। শিবিকুমার রাজ্যের রাজা হয়ে যথাধর্ম রাজত্ব করতে লাগলেন। তিনি দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালন করতেন এবং অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজধানীর ছয়টি স্থানে দানশালা নির্মাণ করে দৈনিক অনেক মুদ্রা ব্যয় করে মহাদান দিতেন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে নিজে দানশালায় গিয়ে দান বিতরণ দেখাশোনা করতেন।

একদিন পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সকালবেলা রাজপালঙ্কে বসে ছিলেন। তখন তাঁর দানকার্যের কথা মনে পড়ল। তিনি দেখলেন, তাঁর বস্তু দান করার আর বাকি নেই। কিন্তু বাহ্যিক দানে তিনি পরিতৃপ্ত নন। তাঁর নিজ দেহের অংশ দান করে আধ্যাত্মিক দান পূর্ণ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। যদি কোনো প্রার্থী তাঁর দেহের মাংসখণ্ড চায় তিনি তা দান করবেন। কেউ হৃৎপিণ্ড চাইলে তাও দেবেন। যদি কেউ গৃহকর্মের জন্য তাঁকে দাস হিসেবে নিতে চায় তাহলে তিনি রাজবেশ ত্যাগ করে দাসত্ব করবেন।

এমনি করে তিনি নানা আধ্যাত্মিক দানের বিষয় চিন্তা করছিলেন। শেষে তিনি চক্ষু দান করার সংকল্প করেন। এরূপ ভাবনা করে রাজা সুগন্ধযুক্ত ষোল কলসি জলে স্নান করলেন। রাজাভরণে সজ্জিত হলেন। তারপর সুসজ্জিত হস্তীরাজের পিঠে আরোহণ করে দানশালার দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর চক্ষুদানের মনোবাসনা জানতে পেরে ভাবতে লাগলেন শিবিরাজ চক্ষুদানে কতটুকু সমর্থ? এটা তো দুস্কর কাজ। জগতে বিরল ঘটনা। দেবরাজ শিবিরাজের দানপারমী পূরণের যোগ্যতা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তিনি অন্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে চলে এলেন। রাজার গমন পথে দাঁড়িয়ে শিবিরাজের মঙ্গল কামনা করে বললেন, মহারাজের জয় হোক। রাজা একথা শুনে হাতি থেকে নেমে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বললেন? অন্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, মহারাজ ! আপনার দানশীলতার কীর্তি ত্রিভুবনে ঘোষিত হয়েছে। আমি একজন অন্ধ, আপনি চক্ষুষ্মান। আমি অনেক দূরদেশ থেকে কষ্ট করে এসেছি। আমাকে আপনার একটি চক্ষু দান করুন, আমি পৃথিবীর আলো দেখতে চাই।

তা শুনে রাজা ভাবলেন আমার কী পরম লাভ! আমি প্রাসাদে বসে চিন্তা করে এসেছি। আজ আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। যা পূর্বে দান করিনি তা আজ দান করব। আজ আমার অনেক আনন্দ হচ্ছে। যাচকের পরিচয় জানতে চেয়ে রাজা বললেন, হে অন্ধ ব্রাহ্মণ ! আমার চক্ষুদান দেখতে আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছেন? মানুষের সবচেয়ে প্রিয় চক্ষু আপনাকে কে দান করবে?

প্রত্যুত্তরে অন্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, যিনি ত্রিলোক শাসন করেন, সেই দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আসতে বলেছেন। তাঁর স্ত্রী সুজাও আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেখতে চান। রাজন ! এবার আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুণ। আমাকে আপনার একটি চক্ষু দান করুন। রাজা উত্তরে বললেন, হে ব্রাহ্মণ ! অচিরেই আপনার আশা পূরণ করা হবে। আপনি একটি চেয়েছেন। আমার দুটি চক্ষুই আপনাকে দান করব। জগতবাসী আমার দানের মহিমা দেখুক।

রাজা ভাবলেন, দানশালার সামনে চক্ষুদান করা ঠিক হবে না। পাত্র-মিত্র সবাই আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসবে। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণকে রাজ অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। রাজবৈদ্য সীবককে খবর দিলেন। রাজাজ্ঞা পেয়ে সীবক চলে এল। রাজা তাঁকে আদেশ দিলেন, 'প্রথমে আমার একটি চক্ষু সাঁড়াশি দিয়ে তুলে ফেল।' সে কথা অন্ধ ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ শুনছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট আসনে বসে আছেন।

এদিকে এ খবর সমস্ত নগরে তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। সবখানে কোলাহল উৎপন্ন হল। রাজার প্রিয়পাত্র, নগরবাসী, অন্তঃপুরবাসী সবাই সমবেত হলো। সকলের পক্ষ থেকে সেনাপতি রাজাকে চক্ষুদান করতে বারণ করলেন।

রাজভাণ্ডারের মণিমুক্তা, ধন-দৌলত সব দান করে দিন। তবুও আপনার আলো প্রদায়ী চক্ষু দেবেন না। উপস্থিত জনতাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে রাজা বললেন, আমি চক্ষু দেব বলে মনস্থির করেছি, কথা দিয়েছি, সংকল্প ত্যাগ করা উচিত নয়। আমার চক্ষুদানে অন্ধ ব্রাহ্মণ জগতের আলো দেখবে। আর আমি বোধির আলোতে উদ্ভাসিত হব। সেনাপতি, অমাত্য সবাই নীরব হয়ে গেলেন।

রাজা সীবককে পুনরায় বললেন, তুমি আমার কল্যাণমিত্র। আমার দান পারমী পূরণে সহায়তা কর। আমার চক্ষু উৎপাটন কর। সীবক তদুত্তরে বললেন, মহারাজ ! বিবেচনা করে দেখুন। চক্ষু দান করা বড় কঠিন কাজ। রাজা বললেন, 'সীবক', আমি আমার সিদ্ধান্তে স্থির। কালবিলম্ব না করে আমার আদেশ পালন কর।

সীবক রাজাকে সুযোগ দেয়ার জন্য প্রথমে শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করলেন না। নানারকম ঔষধ চূর্ণ করে একটি নীলপদ্মের ওপর সেগুলো ছড়িয়ে রাখলেন। ঐ পদ্ম রাজার দক্ষিণ চক্ষুতে বুলিয়ে দিলেন। অমনি চক্ষুর গোলক ঘুরে গেল। সীবক বললেন, মহারাজ, ভেবে দেখুন। আমি এখনো প্রতিকার করতে পারি। রাজা উত্তর দিলেন, না ভাই, আমি সংকল্পে অটুট। সর্বজ্ঞতাই আমার চক্ষু।

রাজবৈদ্য শিবিরাজার চক্ষু উৎপাটন করছেন

এভাবে রাজাকে তিনবার অনুরোধ করলেন। শেষে সীবক বাম হাতে রাজার চক্ষুটি ধরে ডান হাতে অস্ত্র প্রয়োগ করে চক্ষুটি রাজার হাতে দিলেন। ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করে রাজা চক্ষুটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে বললেন, আমার চক্ষু নিন। এ চক্ষু অপেক্ষা আমার নিকট সর্বজ্ঞতা চক্ষু হাজার গুণে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। তিনি মনে মনে পুলকিত হয়ে অনুরূপভাবে অপর চক্ষুটিও ব্রাহ্মণকে দান করলেন। অন্ধ ব্রাহ্মণ সেই চক্ষুটিও নিয়ে রাজভবন থেকে দেবলোকে চলে গেলেন।

চক্ষুদানের কিছুদিন পর রাজা রাজপ্রাসাদে বসে ভাবলেন, যে জন অন্ধ তাঁর রাজ্যের কী প্রয়োজন ? তিনি অমাত্যদের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে উদ্যানে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রামণ্যধর্ম পালনের ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে অমাত্যদেরকে ডেকে বললেন, আমার আর রাজত্বের দরকার নেই। আমি এখন অন্ধ। আমাকে সাহায্য করার জন্য একজন লোক দিলেই চলবে। পাশের উদ্যানেই আমি ধ্যান-সমাধি চর্চা করে অবস্থান করব।

পালঙ্কে বসিয়ে অন্ধ রাজাকে উদ্যানস্থ পুকুর পাড়ে নেয়া হলো। সেখানে উপবেশন করিয়ে অমাত্যরা ফিরে গেলেন। তাঁর সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হলো। রাজা পালঙ্কে বসে নিজের দানের কথা ভাবতে লাগলেন। অমনি দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হলো। তিনি এর কারণ বুঝতে পারলেন এবং ভাবলেন, রাজাকে বর দিয়ে চক্ষু দুটি পূর্বের মতো করে দেব।

এ সংকল্প করে তিনি পুকুরঘাটে গিয়ে শিবিরাজের অদূরে পায়চারি করতে লাগলেন। পায়ের শব্দ শুনে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আমি আপনাকে বর দিতে এসেছি। ইচ্ছা করলে বর চাইতে পারেন। শিবিরাজ বললেন, আমার ধন, জন, বল অনেক আছে। কিন্তু তাতে কী ফল? এখন মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন দেবরাজ বললেন, শিবিরাজ ! আপনি কি কেবল মৃত্যু কামনা করেই মরতে চান, না অন্ধ হয়েছেন বলে মরতে চান? রাজা উত্তর দিলেন, দেবেন্দ্র ! আমি অন্ধ হয়েছি বলেই মরণ চাই।

তখন দেবরাজ বললেন, হে শিবিরাজ ! ইহলোক ও পরলোকে দানফল ভোগ করা যায়। মানুষ পরলোকের সুখ শান্তির আশায় দান করে। আবার ইহজীবনে তার ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও দানকার্য সম্পাদন করে থাকে। যাচক আপনার একটি চক্ষু চেয়েছিল। আপনি দুটি চক্ষু দিয়েছিলেন। সেই পুণ্যফল স্মরণ করে সত্যক্রিয়া করুন। আপনার আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এ সত্যের প্রভাবে আবার চক্ষু লাভ হবে।

তা শুনে রাজা বললেন, দেবরাজ ! যদি প্রকৃতই আপনি চক্ষু দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে উপায় নির্দেশ করবেন না। আমার দানের ফলেই চক্ষু উৎপন্ন হবে। ইন্দ্র বললেন, হে শিবিরাজ ! আমি দেবরাজ ইন্দ্র। কাউকে চক্ষু দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার নিজের দানই সুফল প্রদান করুক।

শিবিরাজ সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম চক্ষুটি উৎপন্ন হলো। তিনি ব্রাহ্মণকে একটির পরিবর্তে দুটি দান করেছিলেন। এ সত্যক্রিয়ার প্রভাবে অপরটিও আর্বিভূত হলো। এ দুটি পূর্বের চক্ষু নয়, দিব্যচক্ষুও নয়, সত্যপারমিতা-চক্ষু।

এ রকম বিস্ময়কর ঘটনা শুনে রাজপরিবারবর্গ, পাত্রমিত্র সবাই সমবেত হলেন। উপস্থিত জনতাকে উপলক্ষ করে দেবরাজ ইন্দ্র উপদেশ দিলেন, তোমাদের রাজার পূর্ব চক্ষু দৃষ্টিবন্ধ ছিল। বর্তমানের চক্ষু দূর দূরান্তের পর্বত ভেদ করে সবকিছু অবলোকন করতে পারবে। তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে ধর্মপথে জীবন পরিচালিত কর। এই বলে তিনি দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

শিবিরাজ পুনরায় চক্ষু লাভ করেছেন - এ সংবাদ অচিরে শিবিরাজ্যে প্রচারিত হলো। তখন রাজ্যবাসী পূজার সামগ্রী নিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে একত্র হলো। তাঁরা মনের আকুতি নিয়ে লোকশ্রেষ্ঠকে শ্রদ্ধা জানালেন। রাজা তাদেরকে দান, শীল, ভাবনা প্রভৃতি পুণ্যব্রতে রত থাকার জন্য উপদেশ দিলেন।

উপদেশ : ত্যাগ ও দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

অনুশীলনমূলক কাজ

বাহ্যিক দান কী বল।

আধ্যাত্মিক দান কী লেখ।

শিবিরাজ কীভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ করলেন? বর্ণনা কর।

পাঠ : ৬

বন্নুপথ জাতক

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সেসময় বোধিসত্ত্ব এক বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বড় হয়ে পাঁচশত গাড়ি নিয়ে নানা জায়গায় বাণিজ্য করতেন।

ব্যবসা উপলক্ষে একবার বোধিসত্ত্ব ষাট যোজন বিস্তৃত এক মরু অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেন। সেই মরুভূমির বালি এতো মিহি ছিল যে তা হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যেত না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে বালি গলে পড়ে যেত। সূর্য ওঠার পর সেই বালুরাশি জ্বলন্ত কয়লার মতো গরম হয়ে উঠত। তখন সেই মরুভূমির ওপর দিয়ে কারও পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হতো না। সেই ভীষণ মরুপথ পার হতো রাতে, দিনে নিতে হতো বিশ্রাম। ব্যবসায়ীরা সঙ্গে জল, তেল, চাল ও লাকড়ি ইত্যাদি রাখত। সূর্য উদয় হলে যাত্রা বন্ধ করে বলদগুলো গাড়ি থেকে খুলে দিত। গাড়িগুলো গোল করে সাজিয়ে নিয়ে মাঝখানে সামিয়ানা খাটিয়ে নিত। সকাল সকাল রান্নাবান্না করে খেয়ে সামিয়ানার নিচে দিন কাটাত। আবার যখন সূর্য ডুবতে বসত তখন তাড়াতাড়ি রান্না করে খেয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করত। নাবিকরা যেমন সমুদ্রে চলার সময় নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করে তেমনি মরূভূমিতে চলার সময় পথ প্রদর্শকরা নক্ষত্র দেখে পথ চিনে নিত।

বোধিসত্ত্ব একদিন সেই মরুভূমির ঊনষাট যোজন পথ অতিক্রম করে গেলেন। তারপর তিনি ভাবলেন, বাকি একযোজন পথও রাতের মধ্যে পার হয়ে যাবেন। এই ভেবে তিনি সন্ধ্যার পর জল, কাঠ ইত্যাদি অনেক জিনিস দরকার নেই দেখে ফেলে দিতে বললেন। এতে বোঝা হালকা হবে এবং মরুভূমি পার হয়ে গেলে সেসব জিনিস সব জায়গায় পাওয়া যাবে। এভাবে তাঁরা চলতে শুরু করলেন। যে গাড়িখানা দলের আগে চলছে তাতে বসা ছিল পথ প্রদর্শক। তিনি নক্ষত্র দেখে পথ চিনিয়ে দিচ্ছিলেন।

দীর্ঘদিন মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পথ প্রদর্শকের ভালো ঘুম হচ্ছিল না। সেই রাতে তার চোখ জুড়ে ঘুম এল। বলদগুলোও আপন খেয়ালে উল্টো দিকে চলতে শুরু করল। সারারাত এভাবে সব গাড়ি চলল। ভোর হওয়ার আগে আগে পথ প্রদর্শকের ঘুম ভাঙল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি বলল, গাড়ি ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও। সমস্ত গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সূর্য ওঠার সময় হয়ে গেল। সবাই দেখল আগের সন্ধ্যায় তারা যেখান থেকে যাত্রা করেছিল ঠিক সেই জায়গাতেই তারা আবার ফিরে এসেছে। তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। গাড়িতে জল নেই, কাঠ নেই। উপায় কী হবে ? উপায় না দেখে তারা বলদগুলো খুলে দিয়ে গাড়ি জড়ো করে সামিয়ানা খাটিয়ে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, আমি চেষ্টা করে উপায় খুঁজে বের না করলে সবাই মারা যাবে। ভোরের সময় ঠাণ্ডায় ঠান্ডায় একবার চারদিকে ঘুরে দেখি, কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা ! এই ভেবে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এক গুচ্ছ ঘাস দেখতে পেলেন। এতে তিনি বুঝতে পারলেন যে ওই জায়গায় নিশ্চয়ই জল আছে। নতুবা সেখানে ঘাস জন্মাতে পারত না। তখন তিনি তাঁর অনুচরদের কোদাল দিয়ে সেখানে খুঁড়তে আদেশ দিলেন। খুঁড়তে খুঁড়তে ষাট হাত নিচে একটা পাথরে কোদালের কোপ পড়ে ঠং করে শব্দ হলো। বোধিসত্ত্ব নিচে নেমে পড়লেন। তিনি পাথরের ওপর কান পেতে শুনতে পেলেন নিচে জলের শব্দ হচ্ছে। তখন তিনি উপরে উঠে এক চাকরকে বললেন, তুমি নিচে নামো। বড় হাতুড়িটা দিয়ে পাথর ভাঙার চেষ্টা করো। চাকরটি খুব উৎসাহী ও উদ্যমী ছিল। সে দ্বিধা না করে প্রভুর আদেশ মতো পাথরের ওপর হাতুড়ির ঘা দিতে লাগল। তাতে পাথর ভেঙে গেল। অমনি ভিতরের জল উপর দিকে ছিটকে বেরিয়ে এল। সবাই মহাখুশিতে স্নান করল, জল পান করল।

বোধিসত্ত্ব মরুভূমিতে পানি খুঁজে পেল

তারপর গাড়িতে যেসব বাড়তি চাকা ও কাঠের সরঞ্জাম ছিল সেগুলো চিরে জ্বালানী কাঠ তৈরি করল। সেই কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাল। রান্নাবান্না করল। সবাই খেল। গরুগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে চাঙ্গা করে তুলল। তারপর কুয়োর পাশে একটা পতাকা পুঁতে দিল, যাতে দূর থেকে পতাকাটি দেখে অন্য বণিকরা সহজে কুয়োটি চিনতে পারে। রাত নামলে তাঁরা মরুভূমি পাড়ি দিলেন। রাতের শেষে গন্তব্য স্থানে পৌঁছালেন। সেখানে বেচাকেনা করে বোধিসত্ত্বের অনেক লাভ হলো। তারপর দেশে ফিরে এসে সুখে বাস করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব পরিণত বয়সে পরলোক গমন করে স্বর্গে গেলেন।

উপদেশ : বিপদে অধীর না হয়ে উদ্ধারের পথ খোঁজা উচিত।

পাঠ : ৭

ন্যাগ্রোধমৃগ জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহের রং ছিল সোনার মতো। শিংগুলো রূপালী, মুখ লাল এবং চোখ দুটো ছিল মনিরত্নের মতো উজ্জ্বল। তিনি ন্যাগ্রোধ মৃগরাজ নাম ধারণ করে পাঁচশ মৃগের দলনেতা হয়ে অরণ্যে বিচরণ করতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। মৃগ মাংস না পেলে তাঁর আহার হতো না। তিনি প্রতিদিন বহু প্রজা সঙ্গে নিয়ে মৃগ শিকারে যেতেন। প্রজাদের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায় তারা বড় বিরক্ত হয়ে পড়ল। শেষে একদিন তারা পরামর্শ করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজার উদ্যানে মৃগদের আহারের জন্য তৃণ রোপন করল। কূপ, পুষ্করণী খনন করে জলের আয়োজন করল। তারপর বন থেকে সকল মৃগ তাড়িয়ে এনে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করাল এবং উদ্যানের দ্বার বন্ধ করে দিল।

এভাবে বহু মৃগ সংগ্রহ করে তারা রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আপনি প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়ে আমাদের কাজে ব্যাঘাত করছেন। আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করে রেখেছি। এখন থেকে নিজে নিজে উদ্যানের মৃগ বধ করে ভোজন করুন।"

ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়ে দেখলেন, সত্যই শত শত মৃগ উদ্যানে বিচরণ করছে। সোনালী বরণ ন্যাগ্রোধ মৃগরাজকে দেখে তিনি বললেন, " তোমাকে অভয় দিলাম। তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস কর।"

তারপর কোনো দিন রাজা উদ্যানে গিয়ে নিজে শরবিদ্ধ করে মৃগ হত্যা করতেন। কোনো দিন তাঁর পাচক গিয়ে মৃগ হত্যা করে নিয়ে এসে রান্না করত। এভাবে প্রতিদিন মৃগ হত্যা করা হতো। কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শব্দ শোনা মাত্র প্রাণ ভয়ে মৃগগুলো চারিদিকে ছুটাছুটি শুরু করে দিত। ফলে প্রতিদিনই বহুমৃগ শরাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করত।

ন্যাগ্রোধ মৃগরাজ তা দেখে ভাবলেন, নিরর্থক অনেক মৃগ নিহত হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি স্থির করলেন, পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন একেকটি মৃগ স্বেচ্ছায় প্রাণ দেবে।

একদিন এক গর্ভবতী হরিণীর পালা এসে পড়ল। হরিণী নিরুপায় হয়ে ন্যাগ্রোধ মৃগরাজের কাছে গেল এবং বলল, "প্রভু ! আমি গর্ভবতী। এবার আমার পালা। এ সময়ে আমি গেলে একসাথে দুটি প্রাণ বিনষ্ট হবে।

আমায় ছেড়ে দিতে অনুমতি করুন।" ন্যাগ্রোধ মৃগরাজ হরিণীকে অভয় প্রদান করে ছেড়ে দিলেন। হরিণীর পরিবর্তে তিনি নিজে গিয়ে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যথাসময়ে পাচক এসে ন্যাগ্রোধ মৃগরাজকে দেখে বিস্মিত হলো। কারণ রাজা তাঁকে অভয় দিয়েছিলেন। তিনি ঘটনাটি রাজাকে জানালেন। রাজা শোনামাত্র পাত্রমিত্রসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি ন্যাগ্রোধ মৃগরাজকে সম্বোধন করে বললেন, "সখা মৃগরাজ! আমিতো তোমায় অভয় দিয়েছিলাম। তবে তুমি কেন আজ নিজের প্রাণ দিতে হাজির হয়েছ?"

ন্যাগ্রোধ মৃগরাজ উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আজ একটি গর্ভবতী হরিণীর পালা ছিল। সে আমার সাহায্য প্রার্থনা করলে আমি তাকে অভয় প্রদান করেছি। আমি তার প্রাণ রক্ষার্থে আরেক জনের প্রাণ বিনাশ করতে পারি না। তাই তার পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে এসেছি।"

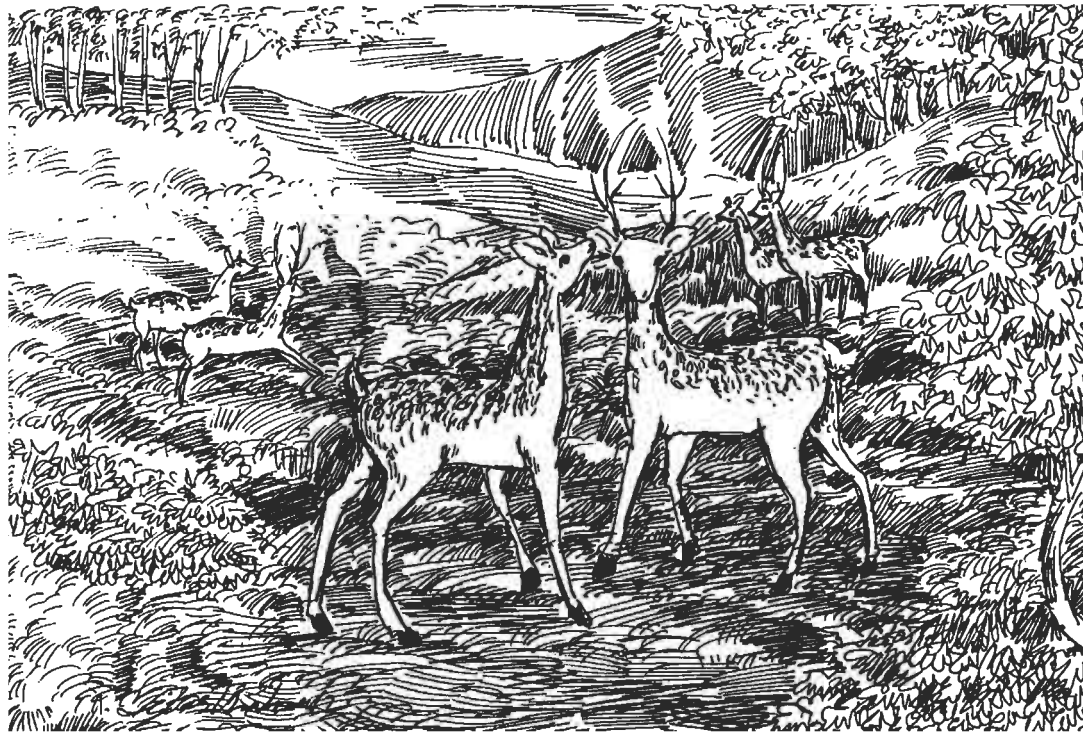

অরণ্যে বিচরণরত মৃগদল

রাজা ন্যাগ্রোধ মৃগরাজের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন, "মৃগরাজ ! আজ আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলেন, তা মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আমি প্রসন্ন মনে আপনাকে ও সেই গর্ভবতী হরিণীকে অভয় দিলাম।"

মহারাজ ! দুটি মাত্র মৃগ অভয় পেল, অবশিষ্টদের ভাগ্যে কী হবে?

- আমি অবশিষ্ট মৃগদেরও অভয় দিলাম।
- আপনার উদ্যানের সকল মৃগ নিঃশঙ্ক হলো, কিন্তু অন্যান্য মৃগদের কী হবে?

- আমি তাদেরও অভয় দিলাম।
- মৃগকুল নিস্তার পেল, কিন্তু অবশিষ্ট চতুষ্পদ প্রাণীদের কী হবে?
- আমি তাদেরকেও অভয় প্রদান করলাম।
- চতুষ্পদ প্রাণী রক্ষা পেল, কিন্তু পাখিদের কী হবে?
- আমি পাখিদেরও অভয় দিলাম।
- পাখিরা অভয় পেল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদের কী হবে?
- মৎস্যাদি জলচরদেরও অভয় দিলাম।

এভাবে রাজা ব্রহ্মদত্তের কাছ থেকে ন্যাগ্রোধ মৃগরাজ সকল প্রাণীর জন্য অভয় প্রাপ্ত হলেন। তারপর তিনি রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়ে বললেন, "মহারাজ, ধর্মপথে চলুন, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, গৃহী, সন্ন্যাসী, পৌর জনপদ–সকলের সাথে যথাধর্ম নিরপেক্ষভাবে আচরণ করুন। তাহলে যখন দেহত্যাগ করবেন তখন দেবলোক প্রাপ্ত হবেন।" ন্যাগ্রোধ মৃগরাজ রাজাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করে আরো কিছুদিন উদ্যানে বসবাস করে অনুচরগণসহ অরণ্যে ফিরে গেলেন। তারপর থেকে রাজা ব্রহ্মদত্ত আর কোনোদিন মৃগ মাংস ভক্ষণ করেননি।

উপদেশ : জীবন সকলের নিকট প্রিয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বোধিসত্ত্ব সকল প্রাণীকে কীভাবে রক্ষা করলেন বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাচীনকালে ভারবর্ষের সমাজব্যবস্থায় কয় প্রকার বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল ?

ক. তিন খ. চার

গ. পাঁচ ঘ. ছয়

২। জাতকের কাহিনীতে শিক্ষা পাওয়া যায় –

i. বর্ণবৈষম্য পরিহার করার

ii. সমাজের সামঞ্জস্যহীন বিষয়গুলো দূর করার

iii. সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রতন চাকমা বন্য প্রাণী শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অপরদিকে তার ছোট ভাই পরিমল চাকমা পঞ্চশীল অনুযায়ী জীবন যাপন করেন। এক পর্যায়ে পরিমল চাকমা তার ভাইকে পেশা পরিহার করে প্রাণীদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হওয়ার জন্য বলেন।

৩। উক্ত ঘটনাটি কোন জাতকের সাথে মিল আছে ?

ক. ন্যাগ্রোধমৃগ জাতক
খ. শিবি জাতক
গ. ভদ্রঘট জাতক
ঘ. গৃধ্র জাতক

৪। উক্ত জাতকের শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে –

i. জীবন সকলের কাছে প্রিয়
ii. সকল প্রাণী সুখী হোক
iii. যথাধর্ম নিরপেক্ষ আচরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কমল বড়ুয়া সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করেন এবং পেনশনের টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তার একমাত্র ছেলে হিমেল বড়ুয়া টাকা তুলে ব্যবসা শুরু করে। এতে ভালো লাভ হলো। কিন্তু কুসঙ্গীদের চক্রে পড়ে সে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে সব সম্পত্তি বিনষ্ট করে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে।

ক. 'জীবন সকলের নিকট প্রিয়' এই উপদেশটি কোন জাতকের ?

খ. শিবিরাজা চক্ষু দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কেন ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটিতে কোন জাতকের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম ভয়াবহ'–জাতকের উপদেশটি হিমেল বড়ুয়ার কার্যকলাপে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে। মতামত দাও।

২। ঘটনা-১ : হৃদয় বড়ুয়া তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান এবং একটি বেসরকরি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়ার সময় মাতা ও পিতাকে প্রণাম করে যান। একদিন অফিসে যাওয়ার সময় বাস দুর্ঘটনায় সবাই আহত হলেও হৃদয়ের শরীরে কোন আঘাত লাগেনি।

ঘটনা-২ : মিলন মুৎসুদ্দী ছোটবেলা থেকে দয়ালু ও দানবীর ছিলেন। একদিন টিভির বিজ্ঞাপনে একজন গরিব মুমূর্ষ রোগীর রক্তের প্রয়োজন বিজ্ঞাপন দেখে হাসপাতালে যান এবং উক্ত রোগীকে রক্ত দান করেন।

ক. জাতক ত্রিপিটকের কোন নিকায়ের অন্তর্গত ?

খ. গৌতম বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন কেন ?

গ. ঘটনা-১ এ কোন জাতকের প্রতিফলন ঘটেছে ? কীভাবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ত্যাগ ও দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম' শিবি জাতকের এই উপদেশটি ঘটনা-২ এর প্রতিফলন - উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বণিকেরা অর্ণবপোতের সাহায্যে . . . পাড়ি দিতেন।

২. তখনকার সমাজে . . . বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল।

৩. বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে . . . ধন্যবাদ দিলেন।

৪. শিবিরাজ সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই . . . চক্ষুটি উৎপন্ন হল।

৫. রাজা ব্রক্ষদত্ত অত্যন্ত . . . ছিলেন।

মিলকরণ

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

বাম	ডান
১. শুদ্ররা ছিলেন	শাসন ক্ষমতা
২. রাজার হাতে ছিল	কর হিসেবে প্রদান করতেন
৩. প্রজারা শস্যের একটি অংশ	শ্রমজীবি
৪. প্রাসাদগুলো ছিল	ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়
৫. জাতকে	কাঠের তৈরি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীনকালে সমাজ ব্যবস্থায় কত প্রকার বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল?

২. রবীন্দ্রনাথ কুশ জাতক অবলম্বনে কি কি নাটক রচনা করেন?

৩. গৃধ্র জাতকে ব্যাধ কেন গৃধ্রকে মুক্ত করে দিলেন?

৪. ন্যাগ্রোধমৃগের রূপ বর্ণনা কর?

৫. কীসের ফলে শিবিরাজার দুটি চক্ষু ফিরে পেল?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জাতকের সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর।

২. ভদ্রঘট জাতকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

বৌদ্ধ তীর্থস্থান

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জেনেছি। তীর্থস্থান সকল ধর্মের মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যেক ধর্মের তীর্থস্থান রয়েছে। বৌদ্ধদেরও অনেক তীর্থস্থান আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব তীর্থস্থান অবস্থিত। তবে অধিকাংশ তীর্থস্থান রয়েছে ভারতে। তীর্থস্থান দর্শন পুণ্যের কাজ। বৌদ্ধরা পুণ্য অর্জনের জন্য তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। এ অধ্যায়ে চারি মহাতীর্থস্থান এবং তাদের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* চারি মহাতীর্থস্থানের বর্ণনা দিতে পারব ;
* চারি মহাতীর্থস্থানের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ।

পাঠ : ১

চারি মহাতীর্থস্থান পরিচিতি

খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে গৌতমবুদ্ধ বর্তমান নেপালের কপিলাবস্তুর লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর সর্বপ্রাণীর কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে তিনি ধর্ম প্রচার করেছেন। গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সেসব স্থান তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনগর, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, নালন্দা, বৈশালী, কোশাম্বী ইত্যাদি। এসব স্থানে বুদ্ধ অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছেন। অনেকবার বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেছেন। অনেক ধর্মোপদেশ প্রদান করেছেন। বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং পৃষ্ঠপোষক রাজা ও মহারাজারা বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এসব স্থানে বিহার, সঙ্ঘারাম, চৈত্য, স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের জীবনের চারটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল চারটি স্থানে। যেমন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন নেপালের লুম্বিনী কাননে। বুদ্ধের সময়কালে স্থানটি কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন বুদ্ধগয়ায়। বুদ্ধের সময়কালে স্থানটি মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রথম প্রচার করেন সারনাথে। বুদ্ধের সময়কালে সারনাথ কাশী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন কুশীনগরে। বুদ্ধের সময়কালে স্থানটি মল্ল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বুদ্ধের জীবনের চারটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে এ চারটি স্থানকে মহাতীর্থস্থান বলে। বৌদ্ধরা জীবনে অন্তত পক্ষে একবার হলেও চারি মহাতীর্থস্থান দর্শন করতে চেষ্টা করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

চারি মহাতীর্থস্থান কী? এগুলোকে কেন মহাতীর্থস্থান বলা হয়?

পাঠ : ২

লুম্বিনী

লুম্বিনী ছিল প্রাচীন কপিলাবস্তু ও দেবদহ নগরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ মনোরম উদ্যান। রানি মহামায়া কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাবার পথে এ উদ্যানে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান হিসেবে বিশ্বব্যাপী এ স্থানের পরিচিতি রয়েছে। বৌদ্ধদের কাছে লুম্বিনী মহাতীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত। লুম্বিনী উদ্যান বর্তমানে রুম্মিনদাই নামে খ্যাত, যা নেপালের বুটল জেলার ভগবানপুর তহসিলের ৩ কিলোমিটার উত্তরে পারিয়া গ্রামে অবস্থিত। সম্রাট অশোক সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী ভ্রমণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জানা যায়, সম্রাট অশোক তাঁর রাজত্বের বিংশতিতম বর্ষে স্থানটি পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি বুদ্ধের জন্মের স্মৃতি বিজড়িত এই পুণ্যস্থানটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য এখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং লুম্বিনী ভ্রমণকালে স্তূপটি দেখতে পান। স্তূপের সন্নিকটে শীর্ষদেশে অশ্বমূর্তিযুক্ত একটি প্রস্তরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্তম্ভটি আবিষ্কৃত হয়। এটি 'অশোক স্তম্ভ' নামে পরিচিত। অশ্বমূর্তি সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের প্রতীক। স্তম্ভটি পরবর্তীকালে মাঝখানে ভেঙে গেলেও এর গায়ে যে শিলালিপি ছিল তা এখনো বর্তমান। শিলালিপিতে প্রাকৃত ভাষায় এরূপ খোদিত আছে – 'এ স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন'। স্তম্ভের গায়ে খোদিত অন্য অনুশাসনলিপি থেকে আরো জানা যায় যে, সম্রাট অশোক লুম্বিনী উদ্যান দর্শনের স্মারক এবং বুদ্ধের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে এ স্থানকে করমুক্ত করেছিলেন। প্রাচীনকালে এখানে একটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম ছিল। কালের গ্রাসে সেটি ধ্বংস হয়ে গেলেও ঐ স্থানে কিছুকাল আগে আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিহারের ভেতরে সিদ্ধার্থের জন্মকাহিনী চিত্রিত প্রাচীন একটি পাথরের ফলক আছে। ফলক চিত্রে মায়াদেবী বাম হাতে শালগাছের একটি ডাল ধরে আছেন। পাশে রয়েছে মায়াদেবীর বোন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। অন্য পাশে দেবতারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে নিচে একটি পদ্মের উপর নবজাত সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে আছেন। বিহারের অনতিদূরে অতীত ইতিহাসের সাক্ষী স্বরূপ একটি ছোট পুকুর আছে। কথিত আছে যে, সিদ্ধার্থের জন্মের পূর্বে রানি মায়াদেবী এ পুকুরে স্নান করেছিলেন।

লুম্বিনী

বর্তমানে এখানে শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, জাপানসহ বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশের বিহার ও অতিথিশালা আছে। নেপাল সরকার লুম্বিনীর উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর দর্শনার্থী লুম্বিনী ভ্রমণে আসেন। নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডু থেকে সড়ক পথে লুম্বিনী যাওয়া যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

লুম্বিনী কেন বিখ্যাত?

শিলালিপিতে প্রাকৃত ভাষায় কী লেখা ছিল?

পাঠ : ৩

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থান। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি যে অশ্বত্থ গাছের নিচে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই অশ্বত্থ গাছের নাম হয় 'মহাবোধি বৃক্ষ'। যে আসনে বসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই আসনের নাম 'বজ্রাসন' বা বোধিপালঙ্ক। এ আসনটি একটি অখণ্ড পাথরে নির্মিত। সম্রাট অশোক তাঁর রাজত্বকালে তীর্থ ভ্রমণে এসে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে বজ্রাসনটি চিহ্নিত করেন। বুদ্ধগয়ায় সেই আসনটি এখনো আছে।

বুদ্ধগয়া মন্দির জগত বিখ্যাত। মন্দিরটি পূর্বমুখী। এটি একটি দ্বিতল ভবন। উপরের তলা থেকে মন্দিরটি ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। মন্দিরের শীর্ষদেশ গোলাকার। মন্দিরের চার কোণায় চারটি ছোট মন্দির আছে। সামনের দুটিতে ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে দুটি পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্তি অপরূপ শোভা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে আছে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের দাঁড়ানো মূর্তি। মন্দিরের গায়ে সারিবদ্ধ কুলুঙ্গিতে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর অনেক মূর্তি আছে। এগুলো পাথরে খোদাই করা। মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে সারা দেয়ালে অপরূপ কারুকাজ আছে। স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এ মন্দির।

মূল মন্দিরের ভিতরে আছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বসা বড় বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধাসনে সিংহ ও হস্তীমূর্তি আছে। বাইরে পাঁচটি কক্ষে সারিবদ্ধ পাঁচটি বুদ্ধমূর্তি আছে। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রথম কে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে পণ্ডিতদের ধারণা, এ মন্দিরটি সম্রাট অশোক, তৎপরবর্তী মিত্রবংশীয় রানী কুরাংগী ও নাগদেবী এবং আরো পরে কুষাণ বংশীয় ষষ্ঠ রাজা কনিষ্ক প্রমুখের পর্যায়ক্রমিক সহযোগিতা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং বুদ্ধগয়া ভ্রমণে আসেন। তিনি মন্দিরটির বিবরণ ভ্রমণ বিবরণীতে লিখে রাখেন। তিনি লিখেছেন, মন্দিরটি ১৬০ ফুট উঁচু। এর প্রশস্ত ভূমির উপর বিশটি সিঁড়ির ধাপ বর্তমান। সুবৃহৎ মন্দিরটি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। তিনি এখানে সম্রাট অশোক নির্মিত আরো একটি অলঙ্করণসমৃদ্ধ চৈত্যগৃহ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

মন্দিরের আশে পাশে 'সপ্ত মহাস্থান' অবস্থিত। বুদ্ধত্ব লাভের পর সেসব স্থানে বুদ্ধ সাত সপ্তাহ অবস্থান করেন। এজন্য এ সাতটি স্থান সপ্ত মহাস্থান নামে পরিচিত। সপ্ত মহাস্থান হলো : বোধিপালঙ্ক, অনিমেষ চৈত্য, চংক্রমণ চৈত্য, রত্নঘর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দ মূল ও রাজায়তন বৃক্ষ। মন্দিরের উত্তর পাশে বুদ্ধের পদচিহ্ন খোদাই করা পাথর আছে। মন্দিরের চারদিকে রয়েছে উঁচু পাথরের প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা ও জাতকের কাহিনী খোদাই করা আছে।

বুদ্ধগয়া মন্দির

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর অগণিত মানুষ বুদ্ধগয়ায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন। বৌদ্ধরা সেখানে মা-বাবা ও পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-দান করেন। অনেকে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে তীর্থযাত্রীদের থাকার সুব্যবস্থা আছে। মহাবোধি সোসাইটি, বিড়লা মন্দির, সার্কিট হাউজ ইত্যাদিতে তীর্থযাত্রী থাকার সুব্যবস্থা আছে। এছাড়া রয়েছে চিন, জাপান, মিয়ানমার, থাইল্যাণ্ড, ভুটান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদের নিজস্ব বিহার ও অতিথিশালা। বুদ্ধগয়া মন্দিরের অদূরে একটি জাদুঘর আছে। এখানে বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুসমূহ সংরক্ষিত আছে।

ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী গয়া থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে বুদ্ধগয়া। বুদ্ধগয়া নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত। নৈরঞ্জনার বর্তমান নাম ফল্গু। বুদ্ধ এ স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তাই এ স্থানের নাম হয় বুদ্ধগয়া। বুদ্ধগয়া থেকে সড়ক পথে রাজগৃহ, নালন্দা প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাওয়া যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধগয়া কেন বিখ্যাত?

সপ্ত মহাস্থানের নাম বল।

পাঠ : ৪

সারনাথ

সারনাথ বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাণসী শহরের অনতিদূরে বরুণা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে স্থানটি 'ইসিপতন মৃগদাব' নামে পরিচিত ছিল। ইতোপূর্বে আমরা ন্যাগ্রোধমৃগ জাতকে মৃগদাবের বর্ণনা পড়েছি। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ এ স্থানে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। সেদিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ হলেন : কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। বুদ্ধ এ পাঁচজন শিষ্যের কাছে প্রথম যে ধর্ম দেশনা করেন তা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' নামে পরিচিত। এ সূত্রেই আছে চতুরার্য সত্য এবং দুঃখ মুক্তির সঠিক পথ মধ্যম পন্থা বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান হিসেবে সারনাথ মহাতীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করে।

সারনাথে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করছেন

প্রথম ধর্মদেশনা ছাড়াও নানা কারণে সারনাথের গুরুত্ব অপরিসীম। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করার পর বারাণসীর শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও তাঁর চুয়ান্নজন বন্ধুকে বুদ্ধ এ স্থানে প্রব্রজ্যা দিয়েছিলেন। এই একান্নজন, পঞ্চবর্গীয় শিষ্যবৃন্দ এবং আরো চারজনসহ মোট ষাটজন ভিক্ষু নিয়ে প্রথম ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম বিধিবদ্ধ সঙ্ঘ। বুদ্ধ সর্বপ্রাণীর হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য এই ষাটজন ভিক্ষুকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ধর্মবাণী প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া বুদ্ধ এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেন।

সারনাথ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল। শতশত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এখানে বাস করতেন। ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্মারক হিসেবে সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তূপটি পাথরের তৈরি। এর উচ্চতা ছিল ১৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ৯৪ ফুট। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং স্তূপটি দেখেছিলেন। এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সারনাথের ধ্বংসস্তূপে বৌদ্ধযুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে ৮৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আরো একটি স্তূপ দেখা যায়। এটি 'চৌখণ্ডি স্তূপ' নামে পরিচিত। পণ্ডিতগণ ধারণা করেন, পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের সঙ্গে বুদ্ধের এখানেই প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তারই স্মারক হিসেবে স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল।

এছাড়া ৭১ ফুট উঁচু ও ৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট বেলে পাথরের একটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভটির মাথায় চার মুখ বিশিষ্ট সিংহমূর্তি আছে। তার উপর একটি ধর্মচক্র আছে। চক্রটি সাম্য, মৈত্রী, শান্তি ও প্রগতির প্রতীকরূপে ভারতীয় জাতীয় পতাকায় স্থান পেয়েছে। স্তম্ভটি ভেঙে যাওয়ায় সিংহমূর্তিটি সারনাথের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। মৃগদাবের অদূরে 'ধামে স্তূপ' দেখা যায়। এতে বুদ্ধের দেহধাতু ছিল বলে ধারণা করা হয়। স্তূপটির চারদিকে বাঁধানো চত্বর আছে। সেখানে তীর্থযাত্রীরা ঘুরে ঘুরে ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করেন।

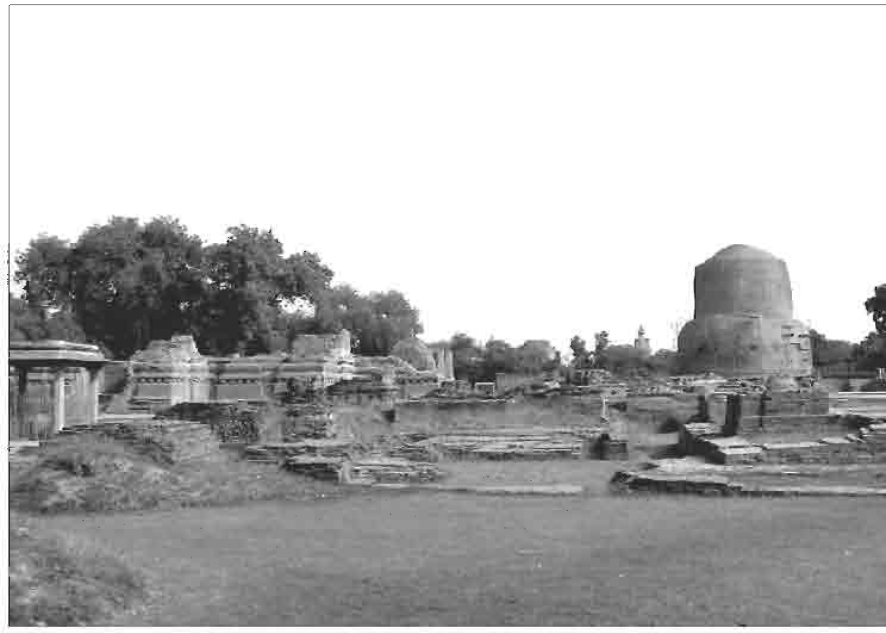

সারনাথের বৌদ্ধ পুরাকীর্তি

এখানে মূলগন্ধকুটির বিহার নামে একটি সুবৃহৎ বিহার ছিল। ভগবান বুদ্ধ যে কুটিরটিতে বাস করতেন তাকে গন্ধকুটির বলা হয়। হিউয়েন সাং বিহারটি ১০০ ফুট উচ্চ বলে বর্ণনা করেছেন। বিহারটি শৈল্পিক কারুকার্য খচিত ইষ্টক দ্বারা নির্মিত ছিল। তিনি এ বিহারে দেড় হাজার ভিক্ষুকে বসবাস করতে দেখেন। ভারতের মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাগারিক ধর্মপালের প্রচেষ্টায় বিহারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়। এখানে বুদ্ধের দেহধাতু আছে যা বছরে একবার জনসাধারণকে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, এখানে 'সদ্ধম্মচক্রজিন' নামে একটি সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম ছিল। এখানে একটি বোধিবৃক্ষের নিচে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উপদেশরত বুদ্ধের মূর্তি আছে। দূর থেকে দেখতে বুদ্ধ ও তাঁর পাঁচ শিষ্যকে জীবন্ত বলে মনে হয়।

সারনাথে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার অনন্য নিদর্শন বহু বিহার, সঙ্ঘারাম, স্তূপ ও স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে ধর্মচক্র মুদ্রায় উপবিষ্ট একটি বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে। এগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। বারাণসীর রেলস্টেশন থেকে সড়ক পথে সারনাথ যাওয়া যায়। এছাড়া সারনাথের কাছেও একটি রেলস্টেশন আছে। এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা ও সরকারি অতিথিশালা আছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম বল।

সারনাথে কি কি বৌদ্ধ নিদর্শন রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ : ৫

কুশীনগর

কুশীনগর বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র তীর্থভূমি। এখানে গৌতম বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। প্রাচীনকালে কুশীনগর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন, কুশীনারা, কুশীগ্রাম, কুশাবতী ইত্যাদি। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কোশিয়া নামক স্থানে এটি অবস্থিত। এটি বৌদ্ধদের চার মহাতীর্থস্থানের অন্যতম। প্রাচীনকালে কুশীনগর হিরণ্যবর্তীর পশ্চিম তীরে ছিল। তখন এটি মল্ল রাজ্যের রাজধানী ছিল।

কুশীনগর

কুশীনগরের অনতিদূরে পাবা। পাবার ধনী পুত্র চুন্দ গৌতম বুদ্ধকে প্রথম দেখেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের আমবাগানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। পরিনির্বাণের আগের দিন বুদ্ধ সেখানে পৌঁছলে চুন্দ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ চুন্দের ঘরে আহার করেন। এটিই তাঁর শেষ আহার। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। অন্তিম শয্যায় বুদ্ধ পরিব্রাজক সুভদ্রকে দীক্ষা দেন। সুভদ্র ছিলেন বুদ্ধের শেষ শিষ্য। তারপর তিনি ভিক্ষুদের উদ্দেশে শেষ উপদেশ দান করেন। ভিক্ষুদের শেষ উপদেশ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, 'ভিক্ষুগণ! সমস্ত সংস্কার অনিত্য, ক্ষয়শীল। তোমরা অপ্রমাদের সাথে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন কর।' অতঃপর তিনি মল্লদের জোড়া শালগাছের নিচে অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের সময় হরিবল নামক এক বৌদ্ধ দাতা এখানে দীর্ঘ ২২ হাত লম্বা একটি শায়িত বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন। এটি এখনো তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পাশে একটি বড় স্তূপ আছে। এর মধ্যে একটি 'পরিনির্বাণ তাম্রপট' নামে তামার পাত দেখা যায়। সম্রাট অশোক এই স্থান পরিদর্শন করে বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান নির্দিষ্ট করেন। চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কুশীনগর ভ্রমণ করেন। তিনি এখানে লোকবসতি বেশি দেখেননি বলে লিখে গেছেন।

উত্তর ভারতের গোরক্ষপুর রেলস্টেশন থেকে সড়ক পথে কুশীনগর যাওয়া যায়। এখানে যাত্রীদের জন্য অতিথিশালা আছে। বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর ও লুম্বিনী এই চার মহাতীর্থে সড়ক পথে যাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী বাসে করে দল বেঁধে চার মহাতীর্থস্থান দেখতে যান ।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ শেষ উপদেশ স্বরূপ কী বলেছিলেন?

বুদ্ধের শেষ শিষ্য কে ছিলেন?

পাঠ : ৬

বৌদ্ধ তীর্থস্থানের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব

ধর্মীয় গুরুত্ব

তীর্থস্থানসমূহের সঙ্গে বুদ্ধ, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অনেক বরেণ্য মনীষীর স্মৃতি জড়িত আছে। তীর্থস্থান ভ্রমণের ফলে তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তাঁদের আদর্শ জীবন ও কর্ম মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তীর্থস্থান ভ্রমণ পুণ্যের কাজ। বিশেষত লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করলে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা মানসপটে জাগ্রত হয়। এতে মন অনাবিল আনন্দে ভরে যায়। বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত হয়, উদারতা বাড়ে, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। অকুশল কর্ম হতে বিরত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদনে মন উৎসাহিত হয়। মৈত্রী, করুণা, সহনশীলতা এবং পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, তীর্থস্থানের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

তীর্থস্থান অতীত ইতিহাসের অনন্য সাক্ষী। তাই তীর্থস্থান ভ্রমণে ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ শুধু বৌদ্ধ ধর্মীয় নয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনারও প্রামাণ্য দলিল। বুদ্ধ এবং প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গ, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্ম-দর্শনের নানা ঘটনা তীর্থস্থানসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন, বৌদ্ধতীর্থ সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সঙ্গীতিতে মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে এবং পাঁচশত পণ্ডিত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে প্রথম বুদ্ধবাণী সংগৃহীত হয়েছিল। জানা যায়, রাজা অজাতশত্রু প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সুতরাং সপ্তপর্ণী গুহা ভ্রমণে ত্রিপিটক সংকলনের ইতিহাস জানা যায়। লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনগরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিত এবং শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিগণ বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া আরো জানা যায়, বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, প্রথম ধর্ম প্রচার এবং মহাপরিনির্বাণ লাভের স্থানসমূহকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সম্রাট অশোক এসব স্থানে স্তূপ, স্তম্ভ, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। এসব স্তূপ, স্তম্ভে লিপিবদ্ধ অনুশাসন থেকে সম্রাট অশোকের শাসনপ্রণালি, ধর্মীয় ও প্রজা কল্যাণমূলক নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায়। পণ্ডিতগণ প্রাচীন তীর্থস্থানগুলোকে অতীতের সভ্যতা

ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে গণ্য করেন। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলো শুধু ধর্ম নয়, নানা শাস্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। বুদ্ধ শিষ্যরা ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, গণিতশাস্ত্র, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদিও শিক্ষা দিতেন। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, ময়নামতি, পাহাড়পুর প্রভৃতি প্রাচীন যুগের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এ শিক্ষাকেন্দ্র গুলোর ইতিহাস পাঠে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও বিহারজীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তাই বলা যায় তীর্থস্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব

তীর্থস্থানসমূহে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা উপাদান ছড়িয়ে আছে। যেমন, বিভিন্ন তীর্থস্থানের ধ্বংসাবশেষ থেকে বিহারের অবকাঠামো, স্তূপ, স্তম্ভ, ভিক্ষুদের ব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রী, বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটি ও পাথরের চিত্রফলক, অনুশাসনলিপি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব প্রত্নসামগ্রী হতে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। যেমনঃ অলঙ্কৃত ইষ্টক দ্বারা নির্মিত বিহারের অবকাঠামোতে সে যুগের উন্নত নির্মাণশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। আবিষ্কৃত মূর্তিগুলো মূল্যবান পাথরে নিখুঁতভাবে নির্মিত, যা প্রাচীনকালের উন্নত ভাস্কর্য শিল্পের স্বাক্ষর বহন করে। চিত্রফলকগুলোতে তৎকালীন ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের নানা কাহিনী অঙ্কিত আছে। স্তূপ ও স্তম্ভ শীর্ষে স্থাপিত অশ্ব ও সিংহ মূর্তিগুলোতে অপরূপ শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। এসব বিবেচনা করে বলা যায়, তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিহারগুলোতে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি আর কী শিক্ষা দেয়া হতো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গৌতমবুদ্ধ কত বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করেন ?

ক. ১৯ খ. ২৯

গ. ৩৫ ঘ. ৪৫

২। বৌদ্ধদের নিকট কুশীনগর অন্যতম পবিত্র স্থান কেন ?

ক. বুদ্ধের জন্মস্থানের জন্য খ. বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের জন্য

গ. বুদ্ধত্ব লাভের কারণে ঘ. বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জয় মুৎসুদ্দী তার বাবার সাথে কাঠমুন্ডু ভ্রমণ করতে যান। সে স্থানে বিহারের ভিতরে একটি পাথরের ফলক দেখতে পান। ফলক চিত্রে মায়াদেবী বাম হাতে শালগাছের একটি ডাল ধরে আছেন, পাশে তাঁর বোন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। বিহারের অনতিদূরে একটি ছোট পুকুরও আছে।

৩। জয় মুৎসুদ্দীর দর্শনীয় স্থানটি কোন স্থানের ইঙ্গিত বহন করে ?

ক. লুম্বিনীর খ. বুদ্ধগয়ার

গ. সারানাথের ঘ. কুশীনগরের

৪। উক্ত স্থান দর্শন করে জয় মুৎসুদ্দী শিক্ষা লাভ করবে –

i. শৈল্পিক সৌন্দর্য

ii. সভ্যতা ও সংস্কৃতি

iii. ধর্মীয় জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শ্রদ্ধেয় দেবমিত্র ভিক্ষু গ্রামের আগ্রহী দায়ক-দায়িকাদের নিয়ে কার্তিকী পূর্ণিমার পর তীর্থস্থান দর্শন করার জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাঁরা প্রথমে যে স্থান পরিভ্রমণ করেন সেখানে উঁচু একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখতে পান। তাছাড়া সে স্থানে গিয়ে একটি অখণ্ড পাথরে নির্মিত বজ্রাসন দর্শন করেন।

ক. বুদ্ধ কোথায় তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রচার করেন ?

খ. গৌতম বুদ্ধের কোন ঘটনা কুশীনগরের সাথে জড়িত ? ব্যাখ্যা কর।

গ. দায়ক-দায়িকাদের দর্শনকৃত বিহারটি পাঠ্যবইয়ের কোন মহাতীর্থের ইঙ্গিত বহন করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দর্শনীয় স্থানটির ধর্মীয় গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। পরীক্ষা শেষে চুমকী বড়ুয়া তার পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে একটি তীর্থস্থান দর্শনের জন্য নেপালে যান। তাঁরা উক্ত তীর্থস্থানে বৌদ্ধযুগের অনেক প্রাচীন নিদর্শন দেখতে পান। পাঁচজন শিষ্যের নিকট বুদ্ধের দেশনারত একটি ছবি তাঁদের নজরে পড়ে। তাছাড়া বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক বুদ্ধমূর্তি ও স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষও তাদের আকৃষ্ট করে। উক্ত বিহার দর্শনের এক পর্যায়ে চুমকী বড়ুয়ার বাবা বললেন, এসব তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ক. গৌতম বুদ্ধ কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন ?

খ. লুম্বিনী মহাতীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত কেন ? আলোচনা কর ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিহারটি কোন তীর্থস্থানের কথা নির্দেশ করে ? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম–চুমকী বড়ুয়ার বাবার বক্তব্যের সঙ্গে তুমি কি একমত? বৌদ্ধ তীর্থস্থান অধ্যায়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর ।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ..... লাভ করেন ।

২. তীর্থস্থান ভ্রমণ ..... কাজ ।

৩. লুম্বিনী উদ্যান বর্তমানে ..... নামে খ্যাত ।

৪. বুদ্ধগয়া ..... নদীর তীরে অবস্থিত ।

৫. মোট ..... ভিক্ষু নিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ।

মিলকরণ

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

বাম	ডান
১. গৌতম বুদ্ধ	ইতিহাসের অনন্য সাক্ষী
২. বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন	বর্তমান নেপালের লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন
৩. তীর্থস্থান অতীত	গুরুত্ব অপরিসীম
৪. তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক	একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
৫. প্রাচীনকালে এখানে	কুশীনগরে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তীর্থস্থান সমূহের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

২. লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থের জন্মকাহিনী বর্ণনা কর ।

৩. বোধিপালঙ্ক কী?

৪. বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্য কারা? তাঁরা কেন বিখ্যাত?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধ তীর্থস্থান সমূহের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

২. বৌদ্ধধর্মে কুশীনগরের গুরুত্ব সম্পর্কে যা জানো লেখ ।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : সম্রাট কণিষ্ক

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে বহু রাজা ও রাজন্যবর্গের অবদান ছিল। তাঁদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিত, অশোক, কণিষ্ক ছিলেন অন্যতম। ইতোপূর্বে আমরা রাজা বিম্বিসার, সম্রাট অশোক সম্পর্কে পড়েছি। এ অধ্যায়ে সম্রাট কনিষ্ক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* সম্রাট কণিষ্কের জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।
* বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সম্রাট কণিষ্কের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
* বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং শিল্পকলা ও স্থাপত্যে সম্রাট কণিষ্কের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

সম্রাট কণিষ্ক

সম্রাট কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। কুষাণগণ চিন সীমান্ত থেকে আগত ইউ-চি জাতির শাখা। ইউ-চি জাতি চিন সীমান্তে বাস করত। কালক্রমে তারা শকদেরকে পরাজিত করে অক্ষু নদীর তীরে বসবাস করতে থাকে। পরে পহ্লবদের রাজ্য অধিকার করে সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। ইউ-চি জাতির পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণগণ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল।

কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁর রাজত্বকাল খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক। তিনি খোটানের রাজা বিজয়কীর্তি ও বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি উত্তর ভারত সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন। গান্ধার এবং কাশ্মীর থেকে বেনারস পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি রাজ্য জয়ের নেশায় নিয়মিত সৈন্যদল নিয়ে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি কাশ্মীরে কণিষ্কপুর নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পেশওয়ারে (পুরুষ পুরে) স্থায়ী প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকে তিনি একটি নতুন অব্দের প্রবর্তন করেছিলেন। তা শকাব্দ নামে পরিচিত ছিল।

সম্রাট কণিষ্ক নিজে সৈন্যদল পরিচালনা করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে সুঙ-লিঙ পর্বত অতিক্রম করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সুঙ-লিঙ পর্বত পামীর উপত্যকা ও খোটানের মধ্যবর্তি স্থানে অবস্থিত ছিল।

সম্রাট কণিষ্ক অত্যন্ত জনদরদী রাজা ছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তক্ষশীলা দলিল থেকে জানা যায় যে, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'দেবপুত্র' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষির সম্প্রসারণেও উদ্যোগী ছিলেন। রোমের স্বর্ণমুদ্রা 'রোমান সলিডাস' এর অনুকরণে সম্রাট কণিষ্ক তাঁর সাম্রাজ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

কণিষ্ক তাঁর শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে 'গ্রামিক' বলা হতো। 'নবকর্মিক' নামে এক ধরনের কর্মচারী ছিল যাঁরা ধর্ম ও সেবামূলক কাজগুলোতে সহায়তা করতেন। সমগ্র সাম্রাজ্য পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল দুইভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক শাসক নিয়োগ করে পরিচালনা করা হতো। এই শাসকগণ 'মহাক্ষত্রপ' নামে অভিহিত হতো। মহাক্ষত্রপগণের সহযোগীদের বলা হতো 'ক্ষত্রপ'। ক্ষত্রপগণ আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ক্ষত্রপদের অনেকে 'রাজা' অভিধায়ও খ্যাত হতেন।

সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পূর্বে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাজ্য জয়ের চেয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেই খ্যাতি অর্জন করেন। মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব থাকলেও পরবর্তি সময় তা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্রাট কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধধর্ম আবার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সজীব হয়ে ওঠেছিল। তাঁর স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রায় গ্রিক, হিন্দু ও নানা দেব-দেবীর মূর্তি অংঙ্কিত ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও খুবই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতেন এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কি কারণে সম্রাট কণিষ্ক বেশি খ্যাতি লাভ করেছিলেন ?

তিনি কেন দেবপুত্র উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ?

পাঠ : ২

বৌদ্ধধর্মে সম্রাট কণিষ্কের অবদান

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সম্রাট কণিষ্ক বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ কারণে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে মানবীয় মূল্যবোধকে জাগাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কুলগুরু ছিলেন সংঘরক্ষ। তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট অশোকের মতো সম্রাট কণিষ্কও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরেন এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রথমে রাজ্য বিস্তারে মনযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সেই রাষ্ট্রনীতি পরিত্যাগ করে তিনি ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, রাজ্য বিস্তারের চেয়ে ধর্মনীতি প্রতিষ্ঠাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পাটলিপুত্র জয় করে ফিরে আসার সময় বুদ্ধের কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি, ভিক্ষাপাত্র ও মহাকবি অশ্বঘোষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। পরে তিনি সে বুদ্ধমূর্তি ও ভিক্ষাপাত্র রাজধানী পুরুষপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অশ্বঘোষকে পুরুষপুর বিহারে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিহারটি কালক্রমে কণিষ্ক বিহার নামে পরিচিতি লাভ করে। সম্রাট কণিষ্কের সময় অশ্বঘোষের খুবই সুখ্যাতি ছিল। তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি মহাকবি, দার্শনিক ও প্রথিতযশা বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন।

এছাড়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তিনি গায়ক, নায়ক, গীতিকার, সুরকার, সংগঠকও ছিলেন। তবে মহাকবি হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। মহাকবি অশ্বঘোষের কারণে সম্রাট কণিষ্কের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে আজও উভয়ের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। অশ্বঘোষের সূত্রালংকার গ্রন্থে সম্রাট কণিষ্কের পূর্ব ভারত জয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আছে।

সম্রাট কণিষ্ক পাটলিপুত্র জয়ের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য পুরুষপুর স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট অশোকের 'দেবানামপিয়' অ্যাখ্যা নিয়ে পালি সাহিত্যে যেমন নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, সেরূপ সম্রাট কণিষ্কেরও 'দেবপুত্র' উপাধি নিয়ে অনেক কথা ও কাহিনী সৃষ্টি হয়। মহাযানী বৌদ্ধরা তাঁকে দেবতা হিসেবে গণ্য করেন।

সম্রাট কণিষ্ক ইতিহাসে প্রধানত দুটি কারণে অমর হয়ে আছেন। প্রথমত তিনি যে বছর সিংহাসনে আরোহণ করেন সে বছর থেকে শকাব্দ প্রচলিত হয়। দ্বিতীয়ত তিনি বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জলন্ধরের কণিষ্ক বিহারে বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চতুর্থ মহাসঙ্গীতি নামে খ্যাত। সম্রাট কণিষ্ক বুদ্ধের পূতাস্থির ওপর স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এছাড়া বহু বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানে স্তূপ ও বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর রাজকার্যের অবসরে বৌদ্ধধর্ম চর্চা করতেন। তিনি বুদ্ধবাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন, বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়েও সঙ্ঘের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি ধর্মগুরু পার্শ্বের সহযোগিতায় এক সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রখ্যাত দার্শনিক বসুমিত্রের সভাপতিত্বে এ মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্য থেকে পাঁচশত ভিক্ষু সংগীতির জন্য নির্বাচিত হন। অশ্বঘোষ সহসভাপতি হিসেবে সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁরা সম্মিলিতভাবে মহাবিভাসাশাস্ত্র নামক ত্রিপিটকের টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। এ সম্মেলনে মূল ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়নি। পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় মহাবিভাসাশাস্ত্র রচিত হয়েছিল এবং গ্রন্থটি মহাকবি অশ্বঘোষের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছিল। মহাবিভাসাশাস্ত্র সর্বাস্তিবাদীদের মূল ধর্মগ্রন্থ জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্রের টীকাগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে এ সঙ্গীতিকে সর্বাস্তিবাদী সঙ্গীতিও বলা হয়। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ মহাবিভাসাশাস্ত্রের অনুকরণে রচিত। সঙ্গীতি শেষে সমগ্র মহাবিভাসাশাস্ত্র তাম্রফলকে খোদাই করে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। মহাযান ধর্মগ্রন্থ রচনার কারণে এ সঙ্গীতির গুরুত্ব অত্যধিক। এ সংগীতিতে সর্বাস্তিবাদীদের প্রধান ভূমিকা ছিল। সম্মেলন শেষে বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সর্বাস্তিবাদই মহাযান বৌদ্ধধর্ম নাম ধারণ করে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চিন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করে।

সম্রাট কণিষ্ক সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : মহাকবি অশ্বঘোষ, দার্শনিক নাগার্জুন ও বসুমিত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ রচয়িতা চরক, পার্শ্ব, সংঘরক্ষ ও মাঠর প্রমুখ। তাঁরা সম্রাট কণিষ্কের শাসনামলে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার চর্চা ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। সম্রাট কণিষ্ক তাঁর সাম্রাজ্যে সৃজনশীল কল্যাণকর্মে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সেসব অমরকীর্তির কারণে তিনি এখনো বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মথুরার কাছে মাত নামক স্থানে খননকার্যের ফলে সম্রাট কণিষ্কের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া বিভিন্ন মুদ্রা ও স্মারকচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সম্রাট কণিষ্কের স্মৃতি ও ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

অনুশীলনমূলক কাজ

মহাকবি অশ্বঘোষ কী কী গুণের অধিকারী ছিলেন?

সম্রাট কণিষ্কের আমলে অনুষ্ঠিত সংগীতিতে কে সভাপতিত্ব করেন?

সম্রাট কণিষ্কের রাজসভার পণ্ডিতদের নাম বল।

পাঠ : ৩

বৌদ্ধশিল্প ও স্থাপত্য বিকাশে কণিষ্কের অবদান

বৌদ্ধশিল্প ও স্থাপত্য বিকাশে সম্রাট কণিষ্কের অবদান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। মৌর্য আমলে বৌদ্ধ শিল্পকলার উদ্ভব হলেও এর বিকাশ ঘটেছিল কুষাণ আমলে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ আমলে গান্ধার অঞ্চলে গ্রিক ভাবধারায় এক শিল্প রীতির উদ্ভব হয়, যা গান্ধারা শিল্পকলা নামে পরিচিত। ক্রমে গ্রিক ভাবধারা বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এলে গান্ধারা শিল্পরীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ শিল্পরীতি অনুসরণ করে সম্রাট কণিষ্কের রাজত্ব কালে প্রথম বুদ্ধমূর্তি তৈরির সূচনা হয়। সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প উৎকর্ষতা লাভ করে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বহির্বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কুষাণ সম্রাটদের প্রবর্তিত শিল্প ও স্থাপত্য রীতি বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও শিল্পাচার্যদের মাধ্যমে চিন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে প্রসার লাভ করে।

বুদ্ধমূর্তির সামনে সম্রাট কণিষ্ক

কুষাণ শিল্প প্রধানত দুটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। একটি গান্ধারা শিল্প এবং দ্বিতীয়টি মথুরা শিল্প। এ দুই শিল্পের আদর্শই ছিল শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতাবোধের প্রকাশ। শাস্ত্রে উল্লিখিত সৌম্য স্থির দৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধের কল্পিত প্রতিরূপ এবং বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী গান্ধারা এবং মথুরা শিল্পকর্মের অন্যতম উৎস ও প্রেরণা ছিল। পেশওয়ারে কণিষ্কের রাজত্বকালে নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধ বিহারগুলোর স্থাপত্য শৈলী আজও শিল্প জগতের অনন্য বিস্ময় হিসেবে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

গান্ধারা শিল্পরীতি কী?

কুষাণ শিল্প প্রধানত কয়টি ধারায় আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সম্রাট কণিষ্ক খ্রিষ্টীয় কত শতকে রাজত্ব করেন ?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

২। বৌদ্ধ ইতিহাসে সম্রাট কণিষ্ক অমর হয়ে আছেন –

i. শকাব্দ প্রচলন করায়

ii. বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করায়

iii. দেবপুত্র উপাধি লাভ করায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

প্রদীপ চৌধুরী একজন জনদরদী জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। তিনি এলাকার উন্নয়নে রাস্তাঘাট, পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া তিনি এলাকার ঐতিহ্য রক্ষার্থে ফলক ও স্তম্ভ নির্মাণ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৩। প্রদীপ চৌধুরীর কর্মকাণ্ড কোন সম্রাটের অনুকরণের ছাপ রয়েছে ?

ক. অশোক খ. বিম্বিসার

গ. কণিষ্ক ঘ. প্রসেনজিত

৪। প্রদীপ চৌধুরীর কর্মকাণ্ডে উক্ত সম্রাটের স্থাপত্যকর্মের কোন শিক্ষার অনুপ্রেরণা?

ক. জনকল্যাণের খ. আত্মসন্তুষ্টির

গ. কর্মের প্রতি সচেতনতার ঘ. ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উথোয়াই মং মার্মা এলাকার একজন প্রভাবশালী জমিদার। তাঁর স্বভাব ছিল শান্ত ও কোমল প্রকৃতির। কিন্তু এলাকাবাসীরা ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকায় তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও কলহ বিবাদ লেগে থাকত। এ দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি বল প্রয়োগের পরিবর্তে ধর্ম চর্চার প্রতি বেশি জোর দেন। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্বক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকেন। এছাড়াও শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতাবাদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তিনি বিভিন্ন শিল্পকর্ম গড়ে তোলেন।

ক. গ্রামের প্রধানকে কী বলা হয় ?

খ. চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজনের কারণ বর্ণনা কর।

গ. উথোয়াই মং মার্মার কর্মকাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের কোন শাসকের সঙ্গে মিল রয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বল প্রয়োগের পরিবর্তে ধর্ম চর্চার গুরুত্ব উথোয়াই মং মার্মার ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তিযুক্ত সম্রাট কণিষ্কের কর্মকাণ্ডের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। সুদর্শী চাকমা শিল্পপতি ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য আবাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একদা ত্রিপিটকের অংশ বিশেষ বিনয়বিধি সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাচন করেন এবং উক্ত পণ্ডিত বিনয় বিধির উপরে একটি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান করেন।

ক. 'দেবানামপিয় উপাধি কে লাভ করেছিলেন?

খ. সম্রাট কণিষ্ক শাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন কেন? বর্ণনা কর।

গ. সুদর্শী চাকমার মহৎ উদ্যোগটিতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কোন কবির আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় সুদর্শী চাকমার কর্মকাণ্ড সম্রাট কণিষ্কের সঙ্গে কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ–যুক্তি প্রদর্শন কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সম্রাট কণিষ্ক ছিলেন ..... বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ।

২. সম্রাট কণিষ্কের রাজত্ব কালেই প্রথম ..... তৈরির সূচনা হয় ।

৩. অশ্বঘোষ ..... হিসেবে সংগীতিতে উপস্থিত ছিলেন ।

৪. প্রখ্যাত দার্শনিক..... সভাপতিত্বে এ মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় ।

৫. পালি ভাষার পরিবর্তে ..... ভাষায় মহাবিভাসাশাস্ত্র রচিত হয় ।

মিলকরণ

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

বাম	ডান
১. সম্রাট কণিষ্ক অত্যন্ত	সৈন্যদল পরিচালনা করতেন
২. কুষা শিল্প প্রধানত	চিন সীমান্তে বাস করত
৩. সম্রাট কণিষ্ক নিজে	জনদরদী রাজা ছিলেন
৪. বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে	দুটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করে
৫. ইউচি জাতি	সম্রাট কণিষ্ক বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট কণিষ্ক কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন?

২. সম্রাট কণিষ্ক কীরকম মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন?

৩. 'কণিষ্ক বিহার' কোথায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কুষাণ বংশের পরিচয় দাও ।

২. সম্রাট কণিষ্কের খ্যাতি লাভের কারণসমূহ বর্ণনা কর ।

৩. কুষাণ শিল্প কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বর্ণনা দাও ।

৪. সম্রাট কণিষ্ক কেন ও কীভাবে সঙ্গীতি অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন লেখ ।

সমাপ্ত

২০১৬
শিক্ষাবর্ষ
৮–বৌদ্ধধর্ম

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জীবসেবা পরম ধর্ম

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :